Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আক্তার

রোলঃ 227022144

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আক্তার

রোলঃ 227022144

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা আক্তার, আইডিঃ 227022144 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফারহানা আক্তার

(স্বাক্ষর)

ফারহানা আক্তার

আইডিঃ 227022144

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা : 5

রোজার উৎপত্তি ও ইসলামে এর প্রচলন 8

রোজার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য: 12

রোজার প্রকারভেদ 19

রোজার শারীরিক উপকারিতা 32

রোজার মানসিক উপকারিতা: বিস্তারিত বিশ্লেষণ 39

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবিদের রোজার উদাহরণ: শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জন... 42

রমজান মাসের বিশেষ আমল এবং রোজার সাথে সম্পর্কিত ইবাদত.................... 45

রোজা ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব 62

উপসংহার.................... 65

ভূমিকা :

ইসলামে রোজা (সাওম) এক মহিমান্বিত ইবাদত এবং এটি ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে একটি। রোজা এমন একটি প্রশিক্ষণ যা মুসলমানদের জীবনে শৃঙ্খলা, তাকওয়া এবং আত্মশুদ্ধি নিয়ে আসে। এটি কেবলমাত্র শারীরিক ইবাদত নয়; বরং এটি মানুষের আত্মা, মনের শক্তি এবং আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্যের গভীরতম প্রকাশ।কুরআন ও হাদিসে রোজার গুরুত্ব এবং ফজিলত সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, যা প্রতিটি মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। রোজা সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াত রোজার তাৎপর্যকে প্রকাশ করে এবং বোঝায় যে রোজার মূল লক্ষ্য তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন। রোজার মাধ্যমে মানুষ শারীরিক চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং নিজের মধ্যে ধৈর্য, সংযম ও আত্মত্যাগের গুণাবলি বিকাশ করে।

রমজান মাসে রোজা পালনের সময় একজন মুসলিম কেবল খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থাকে না; বরং সকল পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা কাজ ত্যাগ করে না, তার খাওয়া এবং পানীয় থেকে বিরত থাকার দরকার নেই। আল্লাহ তার রোজার প্রয়োজন রাখেন না।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ১৯০৩)

রোজা আত্মার প্রশিক্ষণ দেয় এবং মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করার একটি ঢাল হিসাবে কাজ করে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন:

"রোজা হলো একটি ঢাল। যখন তোমাদের কেউ রোজা রাখে, তখন সে অশ্লীল কথাবার্তা বলবে না, কারও সাথে ঝগড়া করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে আসে, তবে সে বলবে, 'আমি রোজাদার।'"

(সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ১৮৯৪)

রোজা পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, যা তার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে সুস্পষ্টভাবে প্রভাব ফেলে। রমজান মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের বন্দি করা হয়। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"রমজান মাস এলে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শিকলে বন্দি করা হয়।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ১৮৯৯)

রোজার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এটি আল্লাহর জন্য একটি বিশেষ ইবাদত। আল্লাহ নিজে বলেছেন:

"রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ১৮৯৪)

রমজান মাসের রোজা মুসলমানদের মধ্যে সহমর্মিতা, দানশীলতা এবং ঐক্যের চেতনাকে বাড়িয়ে তোলে। দরিদ্রদের কষ্ট অনুভব করার মাধ্যমে রোজাদার ব্যক্তি তাদের প্রতি সদয় হতে শেখে।

কুরআনে বলা হয়েছে:

"রমজান মাস, যাতে নাযিল হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে এই মাসটি পাবে, সে যেন এতে রোজা রাখে।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)

রমজান মাসে রোজা শুধু ইবাদত নয়, এটি মুসলিম সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা। এটি মানুষের জীবনে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আমরা কুরআন ও হাদিসের আলোকে রোজার গুরুত্ব, ফজিলত এবং এর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব বিশদভাবে আলোচনা করব। দেখব কিভাবে রোজা একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত করে এবং তাকে সামাজিক জীবনে দায়িত্বশীল করে তোলে।

বর্তমান থিসিসটি রোজার গুরুত্ব এবং ফজিলত সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি গভীর গবেষণা। এটি মুসলিম জীবন ও সমাজে রোজার প্রভাব এবং এর তাৎপর্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে রচিত। রোজার মাধ্যমে ব্যক্তি কীভাবে আল্লাহভীরুতা, শৃঙ্খলা এবং আত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে, তা এই গবেষণায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। থিসিসটি নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে:

1. **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:**
   গবেষণার জন্য প্রথমত বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থ এবং আধুনিক গবেষণার তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটা তথ্য এর জন্য প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াত এবং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশুদ্ধ হাদিস থেকে রেফারেন্স সংগৃহীত হয়েছে।

2. **তথ্যের বিশ্লেষণ:**
   সংগৃহীত তথ্যগুলো বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের গভীরতা বোঝার জন্য কুরআন এবং হাদিসের সরাসরি উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে।
3. **বিষয়বস্তুর বিন্যাস:**
   থিসিসটি বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে রোজার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, প্রকারভেদ, ফজিলত কুরআন এবং হাদিস এর প্রেক্ষাপটে , শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা এবং সাহাবীদের প্রেক্ষাপটে রোযা এর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।
4. **উপস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি:**
   থিসিসটি পাঠকের জন্য সহজবোধ্য করতে বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণমূলক উপস্থাপনার সমন্বয় করা হয়েছে। গবেষণায় প্রতিটি আয়াত ও হাদিসের আরবি এবং বাংলা অনুবাদ উভয়ই সংযুক্ত করা হয়েছে, যাতে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক এবং বোধগম্য হয়।

এই গবেষণায় রোজার আত্মিক ও সামাজিক গুরুত্ব এবং এর বহুমুখী উপকারিতা আলোচিত হয়েছে। এটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রোজার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াবে এবং প্রতিদিনের জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করবে।

এই থিসিস কেবল ধর্মীয় ইবাদতের একটি বিশ্লেষণ নয়; এটি রোজার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কীভাবে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে উন্নত হতে পারে, তার একটি পথনির্দেশ। আশা করা যায়, এই গবেষণা রোজা পালনকারীদের জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

রোজার উৎপত্তি ও ইসলামে এর প্রচলন

ইসলামে রোজার উৎপত্তি এবং ইতিহাস এক গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা বহন করে। এটি এমন একটি ইবাদত, যা শুধুমাত্র ইসলামে নয়, বরং পূর্ববর্তী নবী ও জাতিগুলোর মাঝেও প্রচলিত ছিল। রোজার মাধ্যমে মানুষ তাদের প্রভুর নৈকট্য লাভ করে এবং নিজেকে শুদ্ধ করে।

---

১. পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মাঝে রোজার ইতিহাস

রোজার উৎপত্তি কোনো নির্দিষ্ট যুগের বিষয় নয়; এটি আল্লাহর প্রেরিত সব ধর্মের মূল শিক্ষার অংশ। কুরআনের আয়াতে এটি স্পষ্ট হয়েছে:

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।" *(সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)*

ইয়াহুদি ধর্মে রোজা:

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে রোজার কথা উল্লেখ রয়েছে। মুসা (আঃ) সিনাই পাহাড়ে আল্লাহর সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগে চল্লিশ দিন রোজা পালন করেছিলেন। এটি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

"আর আমি মুসার সাথে ত্রিশ রাতের প্রতিশ্রুতি করেছি এবং দশ রাত যোগ করেছি।" *(সূরা আরাফ: ১৪২)*

এ সময় মুসা (আঃ) খাদ্য ও পানীয় থেকে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করেছিলেন।

খ্রিস্টান ধর্মে রোজা:

ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যেও রোজা ছিল। ঈসা (আঃ) চল্লিশ দিন রোজা রেখেছিলেন, যা বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। এটি ছিল শয়তানের প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকার একটি উপায়।

ইসলামপূর্ব আরবদের মাঝে রোজা:

ইসলামপূর্ব যুগে আরবদের মাঝে রোজার একটি সীমিত ধারণা ছিল। তারা বিশেষ সময়ে উপবাস করত, যা মূলত তাদের নিজস্ব সামাজিক বা ধর্মীয় আচার ছিল। তবে ইসলামে রোজাকে সুনির্দিষ্ট রূপে বাধ্যতামূলক করা হয়।

---

২. ইসলামে রোজার প্রবর্তনের কাহিনী

দুনিয়ার প্রথম জমানা থেকেই রোযার প্রচলন ছিল। আল্লাহ বলেন,

“হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের জন্য সিয়াম (রোজা) বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পারো।“ *(সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)*

আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা সব যুগের নবি-রাসুলদের জন্য রোজা রাখাকে আবশ্যক করে দিয়েছিলেন। ইসলামের আগে নবি-রাসুলদের রোজার কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো-

আদম (আ.)-এর সময় আইয়ামে বিজ বা প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা রাখতে হতো। ‘আইয়ামে বিজ’ অর্থ শুভ্রতার দিনসমূহ। আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে থাকাকালে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেলায় তাঁদের গায়ের রং কালো হয়ে যায়। তাই ফেরেশতারা তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁরাও তওবা করেন। ফলে তাঁদের গায়ের রং সাদা ও সুন্দর হয়। এরপর আল্লাহ আদম (আ.) ও তাঁর উম্মতকে প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখার নির্দেশ দেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, **‘মহানবী (সা.) আইয়ামে বিজের সিয়াম পালন করতেন।’**

হজরত নুহ (আ.)-এর সময়ও রোজার প্রচলন ছিল। তিনি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ছাড়া সারা বছর রোজা রাখতেন। হজরত নুহ (আ.)-এর যুগ থেকে শেষ নবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত; প্রতি মাসে তিনটি রোজার প্রচলন ছিল। অবশেষে আল্লাহতায়ালা রমজান মাসের রোজা দিয়ে এ রোজাকে রহিত করে দিলেন।হজরত নুহ (আ.)-এর পরের সময় নবি ছিলেন হজরত ইবরাহিম (আ.)। তার সময়ও এ একই রোজার বিধান চালু ছিল। আশুরার দিন আল্লাহতায়ালা বনি ইসরাইলকে দুশমন থেকে রক্ষা করলেন। তাই হজরত মুসা (আ.) এ দিনে রোজা রেখেছেন। মহানবি (সা.) নিজেও এ দিনে রোজা রাখতেন এবং তার উম্মতদের এ দিনে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়াও আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে আসমানি কিতাব ‘তাওরাত’ নাজিল করার আগে ৪০ দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম তুর পাহাড়ে রোজা পালনে ক্ষুধা ও পিপাসায় ৪০ দিন অতিবাহিত করেছিলেন। সে হিসেবে মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা ৪০ দিন পর্যন্ত রোজা পালনকে উত্তম বলে বিবেচনা করতেন। ৪০তম দিনে রোজা রাখাকে তারা ফরজ তথা আবশ্যক মনে করতো। আর তা ছিল তাদের সপ্তম মাসের (তাশরিন) দশম তারিখ। এ দশম দিন ছিল তাদের কাছে আশুরা।

এ আশুরার দিনে আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে ১০ আহকাম দান করেছিলেন। আর এ কারণেই তাওরাতে ১০ তারিখ রোজা পালনের জন্য জোর তাগিদ করা

হয়। এছাড়াও ইয়াহুদিদের অন্যান্য ছহিফাগুলোতেও অন্যান্য দিনে রোজা পালনের হুকুম পাওয়া যায়।

হজরত দাউদ (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি ও রাসূল। তার সময়ও রোজার প্রচলন ছিল। এ সময়কার রোজাই ছিল শ্রেষ্ঠ রোজা। হজরত রাসূল (সা.) হজরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.)-কে উদ্দেশ করে বলেন, **'তুমি শ্রেষ্ঠ রোজা রাখবে। আর তা হলো দাউদ (আ.)-এর রোজা। একদিন রোজা রাখবে। আর একদিন রোজা রাখবে না।'** *(মিশকাত)*

হজরত ঈসা (আ.)-এর সময়ও রোজার প্রচলন ছিল। যার প্রমাণ করছে পবিত্র আল-কুরআন,

'তুমি খাও ও পান করো এবং চোখ জুড়াও; যখন তুমি মানুষদের কাওকে দেখতে পাবে তখন বলবে, আমি রহমান আল্লাহর নামে রোজার মানত করেছি। আমি আজ কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।' *(সূরা মারইয়াম, আয়াত : ২৬)*

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সমসাময়িক নবি ছিলেন হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম। তিনি নিজে রোজা রাখতেন এবং তার অনুসারীগণের মধ্যেও রোজা রাখার রীতি বিদ্যমান ছিল।

প্রাক ইসলামি যুগে আরবাসীরাও রোজা সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল ছিল এবং তা পালনে সক্রিয় ছিল। মক্কার কুরাইশরা জাহেলিয়াতের যুগে ১০ মহররম রোজা রাখতো। এ দিনে পবিত্র কাবায় নতুন কিসওয়া বা গিলাফ পরিধান করানো হতো। *(মুসনাদে আহমদ)*

প্রাক ইসলামি যুগে মদিনার ইয়াহুদিরাও পৃথক পৃথকভাবে আশুরার উৎসব ও রোজা পালন করতো। (বুখারি) তাদের রোজা পালনের দিনক্ষণ ছিল তাদের নিজেদের গণনার সপ্তম মাসের ১০ম দিন। প্রিয়নবি মদিনায় হিজরতের পরও ইয়াহুদিরা রোজা পালন করতেন। যা দেখে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, **তোমাদের চেয়ে আমরাই এ রোজ রাখার হকদার বেশি।**

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর রোজা ফরজ হয় দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে। যা ছিল মহানবি (সা.)-এর কিবলা পরিবর্তনের সময় ও হিজরতের অষ্টাদশ মাস। হিজরতের তারিখ থেকে মুসলিমদের হিজরি সাল গণনা শুরু করা হয়।

হিজরি দ্বিতীয় বছরে রমজান মাসে রোজা রাখা বাধ্যতামূলক বা ফরজ ঘোষণা করে আয়াত নাজিল হয় বলে ইসলাম বিশেষজ্ঞরা বলছেন।

এটি কুরআনে ঘোষিত হয়:

"রমজান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্যপথের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাই তোমাদের মধ্যে যে এই মাসটি পাবে, সে যেন রোজা রাখে।" *(সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)*

মহানবি (সা.)-এর ওপর রোজা ফরজ হওয়ার পর, পরে নবি ও রাসূলদের জামানার রোজার যে বিধান ছিল তার ফরজিয়াত রহিত হয়েছে। তবে আগে এ রোজাগুলো সুন্নতি আমল হিসাবে এখনো কার্যকর রয়েছে।

প্রথম রোজার অভিজ্ঞতা:

প্রথম দিকে রোজার বিধান কঠিন ছিল। যদি কেউ ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ত, তবে পরবর্তী দিন সেহরি পর্যন্ত খাওয়া বা পান করা নিষিদ্ধ ছিল। এক সাহাবি, হজরত কাইস ইবনে সা'দ (রাঃ), একদিন ইফতার করতে দেরি করেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন তিনি সারাদিন কিছু খেতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এ ঘটনার পর আল্লাহ রোজার বিধান সহজ করে দেন:

"তোমাদের জন্য রাতে সেহরি ও ইফতারের সময় খাওয়া-পান করা বৈধ করা হয়েছে।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৭)

উমর (রাঃ)-এর ঘটনা:

এক রাতে হজরত উমর (রাঃ) ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার পর স্ত্রী সহবাস করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এ বিষয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল হয়, যেখানে রাতের সময় বৈধ সম্পর্ক এবং খাওয়া-পানার অনুমতি দেওয়া হয়।

---

৩. রোজার সঙ্গে কুরআন অবতরণের সম্পর্ক

রমজান মাসে রোজার সঙ্গে কুরআনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। রমজান মাসেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ বলেন:

"রমজান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" *(সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)*

এটি কেবল শারীরিক সংযম নয়, বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শুদ্ধির মাস। সাহাবারা রমজান মাসে রোজা রাখার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াতে মনোযোগ দিতেন।

---

৪. রোজার প্রথম ইবাদত হিসেবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য

রোজা ছিল সাহাবাদের জন্য আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের একটি পরীক্ষামূলক ইবাদত।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।" *(সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৮৯৪)*

সাহাবারা তাদের জীবনে রোজাকে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন এবং তারা এটি পালন করতেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য।

---

৫. রোজার মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা

ইসলামের প্রথম দিকে রোজা সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রমজান মাসে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে মুসলিমরা প্রথম বড় বিজয় অর্জন করেন। এই বিজয় রোজার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রমাণ।

রোজার উৎপত্তি, এর প্রবর্তন এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। এটি শুধু ইসলামী বিধান নয়, বরং এটি আদি থেকেই মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ইসলামে রোজার বিধান দ্বারা মুসলিমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং শুদ্ধতার পথ অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

রোজার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য:

রোজার সংজ্ঞা

রোজা বা সাওম ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় একটি বিশেষ ইবাদত, যার মাধ্যমে মুসলমানরা নির্দিষ্ট সময়ে (ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পানাহার, শারীরিক চাহিদা এবং সকল পাপাচার থেকে বিরত থাকে।
যখন মারিয়াম (রহঃ) তার এলাকার লোকজন এর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন তখন সমাজ এর লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, ‘ আমি আল্লাহ এর জন্য রোযা রেখেছি ‘। এইখানে রোযা অর্থ পানাহার থেকে বিরত থাকা নয় বরং কথা বলা থেকে বিরত থাকা।
এমনিভাবে যদি কোন চলন্ত ঘোড়া চলতে চলতে থেমে যায় তাহলে এই থেমে যাওয়া ঘোড়াকে আরবি ভাষায় صَائِمٌ (বিরতকারি) বলা হয়। এছারাও অতীতকালে যে ঘোড়াকে জিহাদে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হত তাকে কিছু দিন দানাপানি না নিয়ে প্রশিখন দেওয়া হত, যাতে জিহাদের ময়দানে দানাপানি না পাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে পারে। আরবি

ভাষায় এ ধরনের ঘোড়াকেও صَائِمٌ (বিরতকারি) বলা হয়। এটি কেবল শারীরিক আত্মসংযমের চর্চা নয়, বরং আত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের একটি মাধ্যম। শরীয়তের পারিভাষায় রোযার অর্থ বললে

সুবহে সাদিক উদিত হয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পরযন্ত পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়। হাফেয ইবনে হাযার আস্কালানি (রহঃ) রোযার সংজ্ঞা লিখেছেন, ‘বিশেষ শময়ে বিশেষ শর্তের সাথে বিশেষ বস্তু থেকে বিশেষভাবে বেঁচে থাকাকে রোযা বলা হয়।‘

আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রোজার ফরজ হওয়ার ব্যাপারে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াতে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে যে রোজার উদ্দেশ্য হল তাকওয়া অর্জন, অর্থাৎ আল্লাহভীরুতা ও পাপ থেকে বাঁচার শক্তি। এটি মানুষের মন এবং আত্মার ওপর এমন প্রভাব ফেলে, যা তাকে শুদ্ধ এবং উন্নত করে।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোজার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন:

الصِّيَامُ جُنَّةٌ

"রোজা হলো একটি ঢাল।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ১৮৯৪)

এই হাদিসে রোজাকে ঢালের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা পাপ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

তিনি আরও বলেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমান ও নেক নিয়তের সাথে রমজানের রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী সব পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ২০১৪)

রোযার উদ্দেশ্য বলে শেষ করা যাবে না, তবুও কিছু নিচে তুলে ধরছি

রোজার উদ্দেশ্য

১। বরকত অর্জন

রোযা রাখা হল বিভিন্ন দিক থেকে বরকত এর মূল উৎস। হাদিস শরীফে এসেছে রমজান মাস হল পুরো বছরের অন্তর যদি এই মাসে গুনাহ মুক্ত থাকা যায় তাহলে পুরো বছর গুনাহ মুক্ত থাকা সম্ভব। এজন্যই হযরত মাওলানা মোজাদ্দেদে আলসে সানি (রহঃ) তার স্বীয় গ্রন্থ মাক্তবাতে উল্লেখ করেছেন রমজান মাসে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এত বিপুল পরিমাণে বরকত নাযিল হয় যা পুরো বছর মিলেও নাযিল হয় না । যেমন সমুদ্রের কাছে পানির কয়েকটি ফোঁটা কিছুই না ঠিক তেমনি রমজানের বরকতের সামনে পুরো বছরের বরকত কিছুই না।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,

ان الله تبارك وتعالٰى عتقاء فِيْ كل يوم وليلة يعني فِيْ رمضان وان لكل مسلم فِيْ كل يوم وليلة دعوة مستجابة

"আল্লাহ তাআলা রমজানের প্রত্যেকদিন ও প্রত্যেক রাতে জাহান্নাম থেকে জাহান্নামবাসীদের মুক্তি দান করেন। রমজানের প্রত্যেকদিন ও প্রত্যেক রাতে প্রত্যেক মুমিন বান্দার কোন না কোন দোয়া কবুল করে থাকেন।"

ইবনে মাজাহ শরীফের এক রেওয়াতে এসেছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

ان هذا الشهر عد حضركم وفيه ليله خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم غيرها الا محروم

"এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের ইবাদত থেকে উত্তম । যে ব্যক্তি এ মাসের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকলো সে পুরা বছরের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকলো। শুধুমাত্র বঞ্চিত ব্যক্তি রমজানের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে।"

আরেক বর্ণনায় এসেছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

اتاكم رمضان شهر باركه يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة وحيط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى الى تنافسكم فيه

"তোমাদের নিকট রমজান মাস এসেছে যা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ । এ মাসে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ঢেকে দিবেন , রহমত বর্ষিত করবেন , গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন , দোয়া কবুল করবেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেখবেন তোমাদের মধ্যে আমলের প্রতিযোগিতা কে অগ্রগামী।"

২। তাকওয়া অর্জন

আল্লাহ কুরআনে বলেন:

"...তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেন তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতা অর্জনের মাধ্যমে রোজাদার ব্যক্তি পাপ থেকে দূরে থাকে এবং তার নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়।

তাকওয়া কীভাবে অর্জন করা যায় :

আল্লাহতায়ালার ইবাদতের মাধ্যমে অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

"হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, তিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পারবে।" *(সূরা আল-বাকারা:: ২১)*

৩। আত্মশুদ্ধি

রোজা দেহ ও মনকে শুদ্ধ করে এবং মানুষকে সংযম ও ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দেয়। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং খারাপ কাজ ত্যাগ করে না, তার খাওয়া ও পানীয় থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই।"

(সহিহ বুখারি: হাদিস নম্বর ১৯০৩)

আরেকটি হাদিসে তিনি বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে।"

(সহিহ মুসলিম: হাদিস নম্বর ১১৫১)

তাকওয়া অর্জনের অর্থ হলো রোজাদার ব্যক্তি শয়তানি সব ধরনের কর্মকা- থেকে পবিত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য প্রস্তুত হওয়া। গোনাহের সব পথ ও রাস্তা বন্ধ করে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করা। এতে একজন মুমিন মানবিক গুনাবলির উৎকর্ষ সাধনে সফল হয়। আত্মশুদ্ধির সারকথা হলো তাকওয়া অর্জন ও পাপ বর্জন।

তাহলে বলা যায় তাকওয়া এবং আত্মশুদ্ধি একসাথে অর্জিত হয়। মন এবং শরীর রোযার মাধ্যমে পাপ মুক্ত হয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে। যে রোযার মাসেও আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারল না সে অনেক বড় হতভাগা।

হজরত কাব বিন আজরা (রা.) বলেন, একদা হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা মিম্বরের কাছাকাছি হয়ে বসো। সাহাবায়ে কেরাম সবাই মিম্বরের

কাছাকাছি বসলে হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখেন এবং বলেন 'আমিন।' অত:পর দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখেন এবং বলেন, 'আমিন।' অনুরূপ তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখেও বললেন, 'আমিন।'

বয়ান শেষে নবী করিম (সা.) মিম্বর থেকে নেমে আসলে সাহাবায়ে কেরাম কৌতূহলি হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনাকে তো আগে কখনো এমন করতে দেখিনি। আমাদের এ বিষয়ে কিছু বলুন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে পা রাখি তখন হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে বললেন, যে ব্যক্তি রমজান মাস পেয়েছে; কিন্তু গোনাহ মাফ করাতে পারেনি সে ধ্বংস হোক। তখন আমি বললাম, 'আমিন।'

অতঃপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখি, তখন হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, যার কাছে আপনার নাম পেশ করা হয়েছে; কিন্তু সে আপনার প্রতি দরুদ প্রেরণ করেনি সেও ধ্বংস হোক। তখনো আমি বললাম, 'আমিন।' সর্বশেষ যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখি, তখন হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার কাউকে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে; কিন্তু তাদের সেবা-যতœ করে জান্নাতের মালিক হতে পারেনি সেও ধ্বংস হোক। তখনো আমি বললাম, 'আমিন।' *(বায়হাকি : ১৫৭২)*।

৩। দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতা

রোজা রাখার মাধ্যমে একজন রোজাদার ব্যক্তি দরিদ্রদের কষ্ট অনুভব করে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। রমজান মাসে দানশীলতা ও খুশি ভাগাভাগি করার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

এ মাসের কারণে মানুষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালা বুঝতে পারে। এজন্য এক মুমিনের হৃদয় ধাবিত হয় অন্য মুমিনের সুখ-দুঃখের খবর সন্ধানে। যার বাস্তব রূপ প্রকাশ পায় ইফতারের মাধ্যমে।

রাসুলে পাক সা. এরশাদ করেন,

"রমজান মাসে যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে। সে দোজখ থেকে মুক্তি পাবে আর সে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, কিন্তু এতে রোজাদারের সওয়াব থেকে কিছুই ঘাটতি হবে না অর্থাত্ রোজাদারের সওয়াব কমবে না।"

আল্লাহর রাসুল আরও বলেন,

"লোকেরা ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতার জলদি করবে।" *(মুসলিম ১ খণ্ড :৩২১)*

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন ,

"রমজান এমন একটি মাস, যখন মুমিনদের রিজিক বৃদ্ধি করা হয় এবং তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।"
(সহিহ বুখারি: হাদিস নম্বর ১৮৯৯)
এছাড়াও তিনি বলেছেন:
"দরিদ্রকে খাওয়ানো এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া রোজার মূল উদ্দেশ্যের অংশ।"
(তিরমিজি: হাদিস নম্বর ৬৪১)

৪। শারীরিক ও মানসিক শৃঙ্খলা এবং সুস্থতা

রোজা মানুষের জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। এটি শরীরের জন্য উপকারী এবং মানসিক শান্তি প্রদান করে। বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে রোজার মাধ্যমে শরীরের মেটাবলিজম উন্নত হয় এবং শরীরের বিষাক্ত পদার্থ দূর হয়।

রমজান মাসে দিনের দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার ফলে দেহে জমে থাকা অতিরিক্ত ফ্যাট ও চর্বি কমে যায়। একই সঙ্গে কিডনির মাধ্যমে দেহ থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন দূর হয়, যা শরীরকে বিষমুক্ত করতে সহায়ক। ওজন কমানোর ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর। ইফতার ও সেহরিতে পুষ্টিকর খাবারের প্রাধান্য দিলে সহজেই অতিরিক্ত ওজন কমানো সম্ভব। রোজার মাধ্যমে উচ্চ কোলেস্টেরল, হৃদ্‌রোগ ও স্থূলতা প্রতিরোধ সম্ভব। দীর্ঘ সময় পেট খালি থাকার কারণে হজম প্রক্রিয়া ধীরগতিতে হয়, যা হজম শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। তদুপরি, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও রোজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রোজা মানুষের অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার বদভ্যাস দূর করতে সহায়তা করে। এটি ধৈর্য ও সংযম শেখায়। যারা কোনো ধরনের নেশা থেকে মুক্তি পেতে চান, তাদের জন্যও রোজা একটি কার্যকর উপায়।

ধর্মীয় ইবাদত হিসেবে রোজা রাখার ফলে মানুষ মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে। রোজার সময় স্ট্রেস হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়, যা মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে আত্মপর্যালোচনার সুযোগ তৈরি হয় এবং চিন্তা-চেতনায় উন্নতি আসে।

ডা. আইজাক জেনিংস রোজার বিষয়ে বলেছেন, **"যারা আলস্য, অতিভোজন এবং অসংযমের কারণে নিজেদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, রোজা তাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করে।"**

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে দেখা গেছে, রোজা মানুষের দেহে চাপ সহ্য করার সক্ষমতা বাড়ায়। ফলে রোজাদার ব্যক্তির মানসিক স্থিরতা বজায় থাকে এবং খিঁচুনি ও অস্থিরতা কমে যায়।

শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে রোজার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। এটি একদিকে যেমন মানুষকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল করে, তেমনই জীবনদর্শনকে ইতিবাচক করে তোলে।

৫। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য:

রোজা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"রোজা আল্লাহর জন্য, এবং এর প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দেবেন।"

(সহিহ বুখারি: হাদিস নম্বর ১৮৯৪)

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

"তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের দেহ ও আত্মাকে নিবেদিত করো।"

(সূরা আল-ইমরান: ১৪৬)

তাকওয়া ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর প্রচন্ড বিশ্বাস ও আনুগত্য সৃষ্টিই রোজার উদ্দেশ্য। রোজা মুসলমানদের ওপর একটি ফরজ ইবাদত। সবল, সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর ওপর রোজা নামক ইবাদতকে অবশ্যই পালনীয় হিসেবে ফরজ করা হয়েছে। রোজা অর্থ কতিপয় বিষয় থেকে নির্দিষ্ট একটি সময় বিরত থাকা। নির্দিষ্ট সময় সুনির্দিষ্ট বিষয়কে এড়িয়ে চলা এবং এর মাধ্যমে মানবীয় ইন্দ্রিয়কে বিশুদ্ধ করা।

রোজা এমন একটি আল্লাহ প্রদত্ত ইবাদত যেটা আল্লাহ এবং তার বান্দা ছাড়া কেউ জানে না। উপবাসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় সুনির্দিষ্ট বিষয় থেকে বিরত থেকে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ বান্দাকে বিশুদ্ধ করতে চান। বান্দার ভোগ, বিলাস, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, কাম, ক্রোধ সবকিছুকেই একটা বিশুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করাই হলো রোজার মুখ্য উদ্দেশ্য। যা সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রকাশ করে।

রোযার প্রকারভেদ

নিশ্চিতভাবেই রোজার প্রকারভেদ একটি বিশদ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে প্রতিটি প্রকারের রোজাকে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রতিটি প্রকারের রোজার সুনির্দিষ্ট দিকগুলো আলোচনা করা হবে, যেমন–এই রোজা কখন রাখা হয়, এর বিধান কি, ফজিলত কি এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে এই রোজার গুরুত্ব।

রোজার প্রকারভেদ

রোজাকে সাধারণত ছয়ভাগে বিভক্ত করা যায়:

- ফরজ
- ওয়াজিব
- মাসনুন (সুন্নত)
- মানদুব (মুস্তাহাব)
- মাকরুহু
- হারাম

১। ফরজ

সবার আগে ফরজ রোযায় আসি আমরা। সকল উম্মত এ বিষয়ে একমত সে প্রত্যেক বালেক ব্যক্তির উপর রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজে আইন। মুসলমানদের কেও রমজান মাসের রোজা ফরজ হওয়ার বিষয়ে মতবিরোধ করেননি। অভিধানে রোজা এর অর্থ হল বিরত থাকা শরীয়তের পরিভাষায় রোজা হল রোজার নিয়তে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা ভঙ্গকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা।

রোযা ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

নিম্নোক্ত শর্তাবলী যার মাঝে পাওয়া যাবে তার ওপর রমজান মাসের রোজা যথাসময়ে আদায় করা এবং (যথাসময়ে আদায় করতে না পারলে) কাজা আদায় করা ফরজ হয়।

১। বালেগ হওয়া । নাবালেগ ছেলে মেয়ের উপর রোজা ফরজ নয়।

২। মুসলমান হওয়া। কাফেরদের উপর রোজা ফরজ নয়।

৩। জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। উন্মাদ এর উপর রোজা ফরজ নয়।

৪। দারুল ইসলাম (মুসলিম রাষ্ট্র) এর অধিবাসী হওয়া। যদি দারুল হরব (কাফের রাষ্ট্রের) অধিবাসী হয় তবে রোজা পালন যে ওয়াজিব এর সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

৫। মুকিম ব্যক্তির উপর রোজা আদায় করা ফরজ। সুতরাং মুসাফিরের উপর রোজা আদায় ফরজ নয়।

৬। সুস্থ ব্যক্তির উপর রোজা আদায় করা ফরজ । সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তির উপর রোজা আদায় করা ফরজ নয়

৭। মহিলাগন হায়েজ এবং নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় থাকলে তার উপর রোজা আদায় করা ফরজ । সুতরাং ঋতুমতী ও নেফাসগ্রস্ত মহিলাদের উপর রোজা আদায় করা ফরজ নয়; বরং হায়েজ এবং নেফাসগ্রস্ত মহিলাদের রোযা রাখা জায়েজ হবে না।

এখন কোন রোযা ফরজ রোযা তা নিয়ে কথা বলি।

রমযান এর রোযা ফরজ।

এবং রমযান এর রোযা কোন কারণ বসত বাদ গেলে তা পূরণ করাও ফরজ।

ফরজ রোজা হলো ইসলামিক শরীয়তে অবশ্য পালনীয় রোজা। এটি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ, এবং সক্ষম মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।

উদাহরণ ও কুরআন-হাদিসের দলিল:

1. **রমজানের রোজা:**
   আল্লাহ বলেন:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

2. **রমজান মাসের রোজা পালনের ফজিলত:**
   রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:
   "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশা নিয়ে রমজানের রোজা রাখে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।" *(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৮)*

ফরজ রোজার সংখ্যা:

ফরজ রোজার মধ্যে রমজানের ২৯ বা ৩০টি রোজা অন্তর্ভুক্ত।

২। ওয়াজিব

ওয়াজিব রোজা হলো ইসলামিক শরীয়তে এমন রোজা, যা কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। ফরজ রোজার মতো এটি প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের জন্য পালন করা অপরিহার্য।

i. **নফল রোজার কাজা যা শুরু করার পর ফাসেদ করেছিল।**

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"যখন তুমি নফল ইবাদত শুরু করবে, তাহলে তা পূর্ণ করো।" *(সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯৫৭)*

এর ভিত্তিতে, নফল রোজা ভঙ্গ করলে তা পূরণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কারণ, এটি আল্লাহর প্রতি বান্দার একটি অঙ্গীকারের মতো হয়ে যায়।

ii. **মানতকৃত রোজা।**

কেউ যদি আল্লাহর নামে মানত করে যে, "যদি আল্লাহ আমাকে কোনো বিশেষ নিয়ামত দেন, আমি রোজা রাখব," তবে সেই রোজা রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য মানত করে, সে যেন তা পালন করে।" *(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৬৯৬)*

iii. *বিভিন্ন কাফফারার রোজা।*

কাফফারার রোজা ইসলামে এমন একটি রোজা, যা নির্দিষ্ট গুনাহ বা ভুলের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তিস্বরূপ বা প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে রাখা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং এর উল্লেখ কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায়।

"কাফফারা" শব্দের অর্থ হলো **"মোচন" বা "ঢেকে দেওয়া"**।

কাফফারার রোজা হল সেই রোজা, যা শাস্তি বা মোচনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পরিস্থিতিতে রাখা হয়। এটি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যম।

কাফফারার রোজা রাখতে হয় তখন, যখন কোনো ব্যক্তি ইসলামিক বিধান ভঙ্গ করেন বা গুনাহ করেন। নিম্নে কয়েকটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা হলো:

- *ওজর ছাড়া রমজান মাসে ইচ্ছাকৃত রোজা ভঙ্গ করা*

হাদিসে এসেছে,

"যে ব্যক্তি রমজানের রোজা ভঙ্গ করল এবং তা পূরণের জন্য দুই মাস রোজা রাখল না, সে আল্লাহর সামনে ক্ষমা পাবে না।" *(সহিহ বুখারি)*

কাফফারার জন্য ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোজা রাখা বাধ্যতামূলক।

- *রমজান মাসে ইচ্ছাকৃত দিবসে স্ত্রী সম্ভোগ করা*
- *যেহার করা*

যেহার হলো স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের মা বা অন্য কোনো হারাম সম্পর্কের মহিলার সঙ্গে তুলনা করা। এটি একটি বড় গুনাহ।

এ ক্ষেত্রে কাফফারার জন্য ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোজা রাখতে হবে।

কুরআনে বলা হয়েছে:

"তারা যদি নিজেদের ভুল সংশোধন করতে চায় তবে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোজা রাখতে হবে।"

(সূরা মুজাদালা: ৪)

- *কসম ভঙ্গ করা*

কেউ যদি আল্লাহর নামে কসম করে এবং তা ভঙ্গ করে, তবে কাফফারার রোজা রাখতে হবে। তবে প্রথমে দরিদ্রদের খাবার দান করাই প্রাধান্য পাবে।

কুরআনে বলা হয়েছে:

"তোমরা তোমাদের কসমের কাফফারা পূরণ করো; তোমরা যদি তা না পারো, তবে তিন দিন রোজা রাখো।"

(সূরা মায়েদা: ৮৯)

- *ইহরাম অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ বিষয় লিপ্ত হওয়া*
- *ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করা অথবা বিধানগতভাবে এ পর্যায়ে ভুক্ত এমন কিছু করা*

কাফফারা কখন ওয়াজিব

নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া গেলে কাফফারা আবশ্যক

১। রমজানের রোজা আদায় কালে কোন কিছু ভক্ষণ করলে অথবা পান করলে । সুতরাং যদি রমজানে রোজা আদায় করছেনা এরূপ অবস্থায় কোন কিছু খায় অথবা পান করে তবে কাফফারা আবশ্যক হবে না । অনুরূপভাবে রমজানের রোজার কাজা আদায় কালে কোন কিছু খেলে বা পান করলে কাফফারা আবশ্যক হবে না ।

২। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু ভক্ষণ করলে বা পান করলে । সুতরাং ভুলক্রমে কোনো কিছু ভক্ষণ করলে অথবা পান করলে কাফফারা আবশ্যক হবে না।

৩। যদি রোজাদারের পানাহার ভুলবশত না হয়। অতএব যদি কেউ রাত্র এখনো বাকি আছে অথবা মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে গেছে এর এরূপ ধারনা করত খায় অথবা পান করে, অতঃপর তার কাছে প্রকাশ হলো যে, সে দিনে ভক্ষণ করেছে, তাহলে তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না । সুতরাং রাত বাকি আছে এ ধারণায় অসাবধানতাবশতঃ যদি খায় ও পান করে এরপর দিনে খেয়েছে বলে বুঝে তবে কাফফারা আবশ্যক হবে না।

৪। যদি রোজাদার খাওয়া ও পানে অনন্যপায় না হয় । সুতরাং রোজাদার যদি খেতে অথবা পান করতে অনন্যপায় হয় তবে কাফফারা আবশ্যক হবে না ।

৫। যদি রোজাদার খাওয়া বা পানে জবরদস্তির শিকার না হয় । সুতরাং যদি খাওয়া বা পান এর ব্যাপারে জবরদস্তির শিকার হয়, তবে কাফফারা আবশ্যক হবে না।

কাফফারার নিয়মকানুন

১। একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়া, চাই ক্রীতদাস মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক ।

২। ক্রমাগত দুমাস এভাবে রোজা রাখা , যাতে এই দু মাসের মাঝে ঈদের দিন ও তাশরিকের (১১ ১২ ১৩ জিলহজ) দিন না পড়ে ।

৩। ৬০ জন মিসকিনকে মধ্যম ধরনের খাবার খাওয়ানো , রোজাদার যে খাবার সাধারণত খেয়ে থাকে । এ ধারাবাহিকতা অনুসারেই কাফফারা ওয়াজিব হয় । যে ব্যক্তি ক্রীতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখেনা সে ক্রমাগত দুমাস রোজা রাখবে । যদি এতেও সে সামর্থ্যবান না হয় তবে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে । প্রত্যেক মিসকিনকে দুবেলা তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খেতে পারে এ পরিমাণ খাবার দিতে হবে । মিসকিনদের মধ্যে এমন কেউ না থাকা ওয়াজিব যার ভরণ-পোষন রোজাদারের উপর আবশ্যক ।

যেমন পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী । যদি রোজাদার মিসকিনদের খাদ্যশস্য প্রদান করতে ইচ্ছা করে তবে প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা' গম অথবা আটা অথবা অর্ধ সা' গমের মূল্য অথবা এক সা' যব অথবা খেজুর অথবা খেজুর এক সা' জবের মূল্য অথবা এক সা' খেজুরের মূল্য প্রদান করা তার উপর আবশ্যক ।

iv. বিভিন্ন কাজা রোযা ।

কাজা রোজা হলো সেই রোজা, যা নির্ধারিত সময়ে রাখতে না পারার কারণে পরবর্তী সময়ে পূরণ করতে হয়।

কিছু কারণে কাজা এবং কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়।

নিম্নোক্ত সূরাতে রোজা ফাসেদ হয়ে যায় এবং কাজা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়ঃ

১। যখন রোজাদার এমন কোন খাদ্য ভক্ষণ করে যে দিকে মন আকৃষ্ট হয় এবং তার দ্বারা পেটের চাহিদা পূরণ হয়।

২। শরীয়ত অনুমোদিত ওজর ছাড়া রোজাদার যখন ঔষধ সেবন কর।

৩। যখন রোজাদার পানি অথবা অন্য কোন পানীয় পান করে।

৪। যখন রোজাদার স্ত্রী সম্ভোগ করে।

৫।যখন বৃষ্টির ফোটা গিলে ফেলে যা রোজাদারের মুখে প্রবেশ করে।

৬। যখন রোজাদার গমের দানা চিবিয়ে খায়।

৭।যখন রোজাদার গমের দানা খায় চিবানো ব্যতিরেকে।

৮। যখন রোজাদার একটি তিল অথবা তদ্রুপ কোন বস্তুর মুখের বাহির থেকে নিয়ে গিলে ফেলে।

৯। যখন রোজাদার সামান্য লবন খায়।

১০। যখন রোজাদার বিড়ি সিগারেট অথবা হুক্কার ধোঁয়া পান করে।

১১। যদি রোজাদার মাটি খায় এবং সে মাটি খেতে অভ্যস্ত হয়। তবে যদি সে মাটি খেতে অভ্যস্ত না হয় তবে কাফফারা আবশ্যক হবে না।

এসব কারণ কাফফারা এবং কাজা রোযা উভয় এর জন্য। তবে কিছু কারনের ফলে শুধু কাজা রোযা ওয়াজিব হয়।

নিম্নোক্ত সূরাতে রোজা ফাসেদ হবে এবং তাতে কাজা ওয়াজিব হবে কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

১। শরীয়ত অনুমোদিত কোনো ওজরের কারণে যদি রোজাদার রোজা ভঙ্গ করে যেমন সফর, অসুস্থতা, গর্ভবতী হওয়া, দুগ্ধ দান কর, হায়েজ্, নেফাজ, বেহুশ এবং উন্মাদনা।

২।যদি রোজাদার এমন কোন কিছু ভক্ষণ করে যা সাধারণত ভক্ষণ করা হয় না এবং যার দ্বারা পেটের চাহিদা পূর্ণ হয় না। যেমন শরীয়ত অনুমোদিত কোনো ওজরের কারণে ঔষধ সেবন, আটা, খামির, প্রচুর পরিমাণ লবণ, তুলা, কাগ্ খেজুরের গুতলি এবং মাটি খেতে অভ্যস্ত নয় এমন অবস্থায় মাটি খাওয়া।

৩। নিম্নোক্ত কোন জিনিস যদি রোজাদার গিলে ফেলে । কঙ্কর, লোহা, পাথর, স্বর্ণ, রোপ, পিতল ইত্যাদি।

৪।যদি রোজাদারকে জবরদস্তিমুলক কোন কিছু পান করতে অথবা খেতে বাধ্য করা হয়।

৫। যদি রোজাদার কোন কিছু খেতে অথবা পান করতে অনন্যপায় হয় তাহলে সে খায় অথবা পান করে।

৩। মাসনুন (সুন্নত)

সুন্নত রোযা হল আশুরার অর্থাৎ ১০ মোহররমের রোজা রাখা এবং তার সাথে ৯ মোহররম অথবা ১১ মোহররমের রোজা ও।

আশুরার দিনটি ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিবিজড়িত। এটি ছিল সেই দিন যেদিন মহান আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.) ও তার অনুসারীদের ফেরাউন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন তার সেনাবাহিনীসহ ডুবে গিয়েছিল। এ কারণে মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দিন রোজা রাখতেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এই ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে মুসলিমদের জন্য এই রোজা সুপারিশ করেছেন।
আশুরার রোজার গুরুত্ব

হাদিস থেকে প্রমাণ

১. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত,

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"রমজানের রোজা ছাড়া কোনো মাসের রোজার প্রতি তেমন মনোযোগ দিইনি যতটা আমি মোহররম মাসের রোজার প্রতি মনোযোগ দিই।"

(সহিহ মুসলিম: 1163)

২. ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

"فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ رَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى. فَقَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ."

অর্থ:

"যখন নবী করিম (সা.) মদিনায় আসেন, তখন দেখলেন, ইহুদিরা আশুরার দিনে রোজা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? তারা বলল, এটি একটি সৎ দিন। এই দিনে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে তাদের শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, এবং মুসা (আ.) সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোজা রেখেছিলেন। তখন নবী করিম (সা.) বললেন, 'আমি মুসার অধিকতর নিকটবর্তী।' অতঃপর তিনি রোজা রাখলেন এবং সাহাবীদেরও তা রাখতে আদেশ দিলেন।"

(সহিহ বুখারি: ২০০৪; সহিহ মুসলিম: ১১৩০)

---

৯ এবং ১১ মোহররমের রোজার সাথে রাখার কারণ

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইহুদিদের রোজার সাথে মিল না রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি ৯ তারিখ বা ১১ তারিখের রোজা রাখার কথা বলেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত:

"যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আশুরার রোজা রাখলেন এবং সাহাবীদেরও তা রাখার আদেশ দিলেন, তখন তাঁরা বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটি তো এমন একটি দিন, যা ইহুদিরা সম্মান করে।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তবে আমি ৯ তারিখেও রোজা রাখব।' কিন্তু তিনি পরের বছর আসার আগেই ইন্তেকাল করেন।"

(সহিহ মুসলিম: 1134)

আশুরার রোজার ফজিলত

পূর্বের গুনাহ মাফের প্রতিশ্রুতি

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ."

অর্থ:

"আশুরার রোজার জন্য আমি আল্লাহর নিকট আশাবাদী যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।"

(সহিহ মুসলিম: ১১৬২)

কোরআন থেকে ইঙ্গিত

মোহররম মাস ইসলামের চারটি সম্মানিত মাসের (আল-আশহুরুল হুরুম) একটি।

কোরআনে বলা হয়েছে:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

অর্থ:

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মাসের সংখ্যা বারোটি। এর মধ্যে চারটি মাস হলো পবিত্র।"

(সূরা আত-তওবা: ৩৬)

এই চার মাসের একটি হলো মোহররম।

আশুরার রোজা রাখার নিয়ম

১। ৯ ও ১০ তারিখ বা ১০ ও ১১ তারিখ একসঙ্গে রোজা রাখা।

২। এককভাবে শুধু ১০ তারিখের রোজা রাখা মাকরুহ (অপছন্দনীয়), কারণ এটি ইহুদিদের সাথে মিল হয়ে যায়।

৩। সেহরি ও ইফতারের সময় অনুসারে রোজা পালন করা।

৪। মানদুব (মুস্তাহাব)

মানদুব (মুস্তাহাব) রোজা হলো ঐসব রোজা যা বাধ্যতামূলক নয়, তবে তা পালন করা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। নিম্নোক্ত রোযা গুল মুস্তাহাব রোযার কাতারে পরেঃ

- প্রতিমাসে যেকোনো তিনদিন রোজা রাখা।
- আইয়ামে বীজ অর্থাৎ প্রতি আরবি মাসের ১৩ ১৪ ১৫ তারিখের রোজা ।
- প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা ।

- শাওয়ালের ছয় রোজা ।
- হজ পালনকারী ছাড়া অন্যদের জন্য (৯ জিলহজ) আরাফার দিনের রোজা।
- হযরত দাউদ (আঃ) এর রোজা। তাহলো একদিন রোজা রাখা একদিন ইফতার অর্থাৎ রোজা বর্জন করা। ওইটাই সর্বোত্তম রোজা এবং আল্লাহ তালার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় রোজা

নিম্নে উল্লেখিত প্রতিটি মুস্তাহাব রোজার বিস্তারিত ব্যাখ্যা, হাদিস এবং কোরআনের প্রাসঙ্গিক অংশ প্রদান করা হলো।

---

১. প্রতি মাসে যেকোনো তিনদিন রোজা রাখা

প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। এটি পুরো মাস রোজা রাখার সওয়াবের সমতুল্য।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ."

অর্থ:

"প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা গোটা বছরের রোজা রাখার সমতুল্য।"

(সহিহ বুখারি: ১৯৭৯, সহিহ মুসলিম: ১১৬০)

এই তিন দিন যেকোনো হতে পারে, তবে আরবি মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রাখার ফজিলত বিশেষ।

---

২. আইয়ামে বীজ অর্থাৎ ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোজা

আয়্যামে বীজ অর্থ "উজ্জ্বল দিনগুলো"। এই দিনগুলোতে রোজা রাখা সুন্নত এবং ফজিলতপূর্ণ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ."

অর্থ:

"রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন: ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখ।"

(সুনান তিরমিজি: ৭৬১)

---

৩. প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা বিশেষ ফজিলতপূর্ণ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ."

অর্থ:

"সোমবার ও বৃহস্পতিবার সমস্ত কাজ (আমল) উপস্থাপিত হয়। আমি চাই আমার আমল যখন উপস্থাপিত হয়, তখন আমি রোজাদার থাকি।"

(সুনান তিরমিজি: ৭৪৭, সহিহ মুসলিম: ১১৬২)

---

৪. শাওয়ালের ছয় রোজা

শাওয়ালের মাসে ছয়টি রোজা রাখা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। এটি রমজানের রোজার পরিপূরক হিসেবে গণ্য হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ."

অর্থ:

"যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখে এবং এরপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখে, সে যেন পুরো বছর রোজা রাখল।"

(সহিহ মুসলিম: ১১৬৪)

---

৫. নয় জিলহজ আরাফার দিনের রোজা

আরাফার দিনের রোজা মহান ফজিলতপূর্ণ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ."

অর্থ:

"আরাফার দিনের রোজা গত বছরের এবং আগামী বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।"

(সহিহ মুসলিম: ১১৬২)

---

৬. হজরত দাউদ (আ.)-এর রোজা

হজরত দাউদ (আ.)-এর রোজা হলো সর্বোত্তম রোজা। একদিন রোজা রাখা এবং একদিন না রাখা।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"أَفْضَلُ الصِّيَامِ، صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا."

অর্থ:

"সর্বোত্তম রোজা হলো হজরত দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি একদিন রোজা রাখতেন এবং একদিন রোজা ভঙ্গ করতেন।"

(সহিহ বুখারি: ১৮৭৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫৯)

মুস্তাহাব রোজাগুলো আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। প্রতিটি রোজার নিজস্ব ফজিলত রয়েছে, যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক করে।

৫। মাক্রুহু রোযা

মাকরূহ রোজা সেই রোজাগুলো যেগুলো রাখা নিষিদ্ধ নয় তবে অপছন্দনীয়, অর্থাৎ শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলোতে কিছু ত্রুটি বা অযাচিত দিক রয়েছে। এগুলোর বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়।

- আশুরার রোজা যদি শুধু ওই দিনেই রোজা রাখে সাথে ৯ মোহররম বা 11 মোহররম রোজা না রাখেন।
- শনিবার দিনের রোজা যদি শুধু শনিবারে রোজা রাখে।
- বেসাল রোজা তা হল সূর্যাস্তের পর কোনরকম ইফতার না করে পরের দিনের রোজা পূর্ব দিনের সাথে মিশিয়ে দেওয়া।

নিম্নে উল্লেখিত তিনটি মাকরূহ রোজার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

---

১. আশুরার রোজা শুধু ১০ মুহাররমে রাখা

রাসুলুল্লাহ (সা.) ১০ মুহাররমের রোজাকে ফজিলতপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তবে শুধুমাত্র এই দিনে রোজা রাখা মাকরূহ, যদি এর সাথে ৯ মুহাররম বা ১১ মুহাররম রোজা যোগ না করা হয়।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন:

"حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ"

অর্থ:

"যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আশুরার রোজা রাখলেন এবং তা রাখার আদেশ দিলেন, সাহাবারা বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বিশেষ সম্মান করে।' তিনি বললেন: 'আল্লাহ চাইলে আমরা আগামী বছরে ৯ মুহাররমের রোজাও রাখব।'"

(সহিহ মুসলিম: ১১৩৪)

শুধু ১০ মুহাররমে রোজা রাখা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনুকরণে পরিণত হতে পারে। তাই এর সাথে ৯ বা ১১ মুহাররম যোগ করা সুন্নত।

২. শুধু শনিবারে রোজা রাখা

শুধু শনিবারে রোজা রাখা মাকরূহ, কারণ এটি ইহুদি ধর্মের একটি বিশেষ দিন। ইসলাম ইহুদিদের সঙ্গে মিল এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرٍ، فَلْيَمْضُغْهُ."

অর্থ:

"শনিবারে রোজা রেখো না, যদি তা তোমাদের ওপর ফরজ করা না হয়। যদি রোজা ভঙ্গের জন্য কোনো কিছু না পাও, তবে আঙুরের খোসা বা গাছের ডাল চিবাও।"

(সুনান তিরমিজি: ৭৪৪, আবু দাউদ: ২৪২১)

শুধু শনিবারে রোজা রাখা নিষেধ হলেও অন্য রোজার সাথে শনিবার যুক্ত করলে তা বৈধ।

---

৩. বেসাল রোজা (ইফতার না করে একদিনের রোজা আরেকদিনের সাথে মিশিয়ে ফেলা)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বেসাল রোজা থেকে নিষেধ করেছেন। এটি শারীরিকভাবে দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারে এবং শরিয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন:

"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي."

অর্থ:

"রাসুলুল্লাহ (সা.) রোজা সংযুক্ত (বেসাল) রাখার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। এক মুসলিম ব্যক্তি বললেন: 'আপনি তো সংযুক্ত রোজা রাখেন, হে আল্লাহর রাসূল!' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: 'তোমাদের মধ্যে কে আমার মতো? আমি এমন অবস্থায় রাত যাপন করি, যখন আমার প্রভু আমাকে খাওয়ান ও পান করান।'"

(সহিহ বুখারি: ১৯৬৪, সহিহ মুসলিম: ১১০৩)

বেসাল রোজা রাখা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য বিশেষ অনুমোদিত ছিল, তবে সাধারণ মুসলিমদের জন্য এটি নিষিদ্ধ।

৬। হারাম

হারাম রোজা সেই রোজা যেগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এগুলোতে শরিয়ত স্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং এ ধরনের রোজা রাখা ইসলামের বিধান পরিপন্থী। হারাম রোযা গুল হলঃ

- ঈদুল ফিতরের দিনের রোজা রাখা
- ঈদুল আযহার দিনের রোজা রাখা
- আইয়ামে তাশরিকের রোজা। যা হল, ১১, ১০, ১৩ জিলহজে রোজা রাখা

হারাম রোজার বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

---

১. ঈদুল ফিতরের দিনের রোজা রাখা নিষিদ্ধ

ঈদুল ফিতরের দিন রোজা রাখা হারাম। এই দিনটি মুসলিম উম্মাহর জন্য আনন্দ ও খুশির দিন। এ দিনে রোজা না রেখে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন:

".نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ"

অর্থ:

"রাসুলুল্লাহ (সা.) দুই দিনের রোজা থেকে নিষেধ করেছেন: ঈদুল ফিতরের দিন এবং কোরবানির দিন।"

(সহিহ বুখারি: ১৯৯১, সহিহ মুসলিম: ১১৩৭)

ঈদুল ফিতরের দিনে রোজা রাখা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা হিসেবে গণ্য হবে।

---

২. ঈদুল আযহার দিনের রোজা রাখা নিষিদ্ধ

ঈদুল আযহার দিনও রোজা রাখা হারাম। এটি কোরবানির দিন এবং মুসলিমদের জন্য বিশেষ ইবাদতের সময়।

উপরে বর্ণিত হাদিসে ঈদুল ফিতরের সাথে ঈদুল আযহার দিনের রোজার নিষেধাজ্ঞাও অন্তর্ভুক্ত।

".نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ"

ঈদের দিন মুসলিমদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ামত ভোগ করার আদেশ রয়েছে।

---

৩. আইয়ামে তাশরিকের দিন রোজা রাখা (১১, ১২, ১৩ জিলহজ)

আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলোতে রোজা রাখা নিষিদ্ধ। এই দিনগুলোতে তাশরিকের তাকবির বলা এবং আনন্দ উৎসব করার আদেশ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ

অর্থ:

"সংখ্যাতীত কয়েক দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর। কেউ যদি দুই দিনের মধ্যে ফিরে আসে তবে তার জন্য কোনো পাপ নেই, আর কেউ যদি বিলম্ব করে তবে তার জন্যও কোনো পাপ নেই, তবে শর্ত হলো তাকওয়া অবলম্বন।"

(সুরা বাকারা: ২০৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

".أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ"

অর্থ:

"তাশরিকের দিনগুলো খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহর জিকিরের দিন।"

(সহিহ মুসলিম: ১১৪১)

তাশরিকের দিনগুলিতে আনন্দ উৎসব করা ইসলামের আদেশ। এ সময় রোজা রাখা নিষিদ্ধ।

রোজার শারীরিক উপকারিতা

রোজার শারীরিক উপকারিতা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, কুরআন এবং হাদিসের আলোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এই ইবাদত শুধু আত্মিক উন্নতির জন্য নয়; এটি শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী।

রোজার শারীরিক উপকারিতা নিয়ে অনেকের মাঝে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, রোজা রাখলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। তবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং ইসলামের শিক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, রোজা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। রোজার সময় শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত খাদ্য এবং বিষাক্ত পদার্থ দূর হয়।

শরীরের সঞ্চিত খাদ্য: প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ

আমাদের দেহে সব সময় কিছু সঞ্চিত খাদ্য থাকে, যা প্রয়োজনের সময় শরীরকে পুষ্টি সরবরাহ করে। একজন শীর্ণ মানুষ হলেও তার শরীরে এই সঞ্চিত খাদ্য থাকে। রোজার সময় এই সঞ্চিত খাদ্য ধীরে ধীরে ব্যবহার হয়। ফলে রোজা শরীরকে দুর্বল না করে বরং এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিশোধন প্রক্রিয়া বাড়ায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ক্ষুধার অনুভূতি অনেকাংশে মানসিক এবং অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। যদি একজন মানুষ নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার অভ্যস্ত হন এবং সেই সময়ে না খান, তখন তিনি কিছু সময়ের জন্য ক্ষুধার্ত অনুভব করেন। কিন্তু কিছু সময় পর এই অনুভূতি মস্তিষ্কে আর থাকে না।

খাওয়া: অভ্যাসের দাসত্ব এবং রোজার গুরুত্ব

মানুষ মূলত অভ্যাসের দাস। কেউ যদি দিনের তিনবেলা খাওয়ার অভ্যস্ত হন, তবে নির্দিষ্ট সময়ে তার পাকস্থলী কাজ শুরু করে এবং ক্ষুধার অনুভূতি তৈরি হয়। তবে খাবার গ্রহণ না করলে কিছুক্ষণ পর সেই ক্ষুধা দূর হয়ে যায়। এজন্যই দেখা যায়, রোজার প্রথম দুই-তিন দিন একটু কষ্ট হলেও পরে শরীর তা মেনে নেয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য বেশি খাওয়া নয়, বরং কম খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বাংলা প্রবাদে বলা হয়, **"বেশি বাঁচতে হলে কম খাও।"**

ইবনে সিনার পরামর্শ: উপবাসের উপকারিতা

১১শ শতাব্দীর বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনা রোগীদের তিন সপ্তাহের জন্য উপবাস পালনের পরামর্শ দিতেন। তার মতে, শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলোকে বিশ্রাম দিলে তা আরও কার্যকর হয়। রোজা মূলত পাকস্থলী ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এই বিশ্রামের সুযোগ দেয়।

রোজার ফলে:

১। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা বাড়ে।

২।পরিপাকতন্ত্র বিশ্রাম পায়।

৩। শরীরে সঞ্চিত বিষাক্ত পদার্থ দূর হয়।

বিষাক্ত পদার্থের পরিশোধন এবং রোজার ভূমিকা

দেহের কোষগুলোতে জমে থাকা বিষাক্ত পদার্থ রোজার সময় শরীর থেকে বের হয়ে যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, রোজার মাধ্যমে:

- রক্তের প্রবাহ উন্নত হয়।
- হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি কমে।

ডা. জুয়েলার্স এমডি বলেছেন:

"যখন একবেলা খাবার বন্ধ থাকে, তখন দেহ নিজেই সেই সময়কে রোগমুক্তি সাধনায় ব্যবহার করে।"

শরীর যখন খাবার পরিপাকে ব্যস্ত থাকে না, তখন সেটি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করতে পারে, যেমন বিষাক্ত পদার্থ বের করা এবং নতুন কোষ তৈরি করা। চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক ড. হিপোক্রেটস বহু শতাব্দী আগে বলেছিলেন:

"The more you nourish a diseased body, the more you harm it."

অর্থ:

"অসুস্থ দেহে যত বেশি খাবার দেবে, ততই রোগ বাড়বে।"

রাশিয়ার বিখ্যাত শরীর বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. ইউরি নিকোলাভ ১৯৬০ সালের ২২শে মার্চ লন্ডনে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, **তিনটি নিয়ম পালন করলে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যাবে এবং বার্ধক্য বিলম্বিত হবে।**

১. শারীরিক পরিশ্রম করা, যা দেহের শিরা-উপশিরায় সতেজতা আনে।

২. অধিক হাঁটাচলা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা।

৩. প্রতি মাসে অন্তত একদিন উপবাস থাকা।

ইফতার এবং সেহরির সময় খাদ্য গ্রহণের নিয়ম

রোজার সময় পাকস্থলী সারাদিন সংকুচিত অবস্থায় থাকে। তাই ইফতারের সময় অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে পাকস্থলীতে সমস্যা হতে পারে।

- ইফতার শুরু করা উচিত পানি এবং খেজুর দিয়ে, যা সহজে হজম হয়।
- রাসুলুল্লাহ (সা.) ইফতারের জন্য এই নিয়ম অনুসরণ করতেন।

হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"তোমরা সেহরি খাও। কারণ সেহরির মধ্যে বরকত রয়েছে।"

(সহিহ বুখারি: ১৯২৩)

সেহরি খাওয়ার পর ফজরের নামাজ পড়ার মাধ্যমে সকালের কার্যক্রম শুরু করা শরীরের জন্য উপকারী।

রোজা এবং দেহের শক্তি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, রোজার সময়:

১। শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়া উন্নত হয়।

২। সংরক্ষিত শক্তি ব্যবহৃত হয়, যা দেহের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

৩। ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেহের অপ্রয়োজনীয় চর্বি পোড়ে, যা ওজন কমায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"রোজা রাখো, সুস্থ থাকবে।"

(মুসনাদে আহমদ: ১৬৫২২)

রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতি মাসে তিন থেকে চারটি নফল রোজা রাখার কথা বলেছেন। তিনি নিজে নফল রোজা রাখতেন এবং সাহাবিদেরও এই ইবাদতে উৎসাহ দিতেন।

হাদিস:

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন:

"صُمْ مِن كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ"

অর্থ:

"প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখ।"

(সহিহ বুখারি: ১৯৭৯, সহিহ মুসলিম: ১১৬০)

১. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে রোজার শারীরিক উপকারিতা

i) বিপাকক্রিয়ার উন্নতি (Metabolism Boost):

রোজার সময় শরীরের মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ সময় খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার ফলে:

- শরীর জমে থাকা ফ্যাট ভেঙে শক্তি উৎপাদন করে।
- লিভারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে।

ii) ডিটক্সিফিকেশন (Detoxification):

রোজা কিডনি ও লিভারকে অতিরিক্ত কাজের চাপ থেকে বিরত রাখে, ফলে জমে থাকা বিষাক্ত পদার্থ (toxins) সহজে বের হয়। এটি ক্যানসারসহ দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

iii) ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ:

রোজার সময় শরীরের কোষগুলো মেরামত হয়। এতে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

iv) হরমোন ভারসাম্য:

রোজা ইনসুলিন এবং গ্রোথ হরমোনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

- **ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ:** রোজা রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে।
- **স্ট্রেস হরমোন নিয়ন্ত্রণ:** কর্টিসল (Cortisol) হরমোনের নিঃসরণ কমায়, যা মানসিক চাপ দূর করতে সাহায্য করে।

v) ওজন নিয়ন্ত্রণ:

বইয়ে বলা হয়েছে, নিয়মিত রোজা ওজন কমাতে সাহায্য করে। শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত চর্বি ভেঙে শক্তি উৎপাদনের জন্য রোজা অত্যন্ত কার্যকর।

---

২. কুরআনের আলোকে শারীরিক উপকারিতা

i) রোজার গুরুত্ব:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"

অর্থ:

"রোজা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৪)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, রোজা মানুষের জন্য শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে উপকারী।

ii) খাদ্যের সীমাবদ্ধতার নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"

অর্থ:

"তোমরা খাও এবং পান করো, তবে অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।"

(সূরা আল-আরাফ: ৩১)

এই নির্দেশনার সাথে রোজার ধারণা মিলে যায়, কারণ রোজা সংযম শেখায় এবং অতিভোজন থেকে বিরত রাখে।

---

৩. হাদিসের আলোকে শারীরিক উপকারিতা

i) পেট নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ."

অর্থ:

"মানুষের জন্য তার পেটের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কিছু নেই। আদম সন্তানের জন্য কয়েকটি গ্রাস খাবার যথেষ্ট, যা তাকে শক্তি জোগায়।"

(তিরমিজি: ২৩৮০)

ii) ক্ষুধার উপকারিতা:

রোজা মানুষের শরীরকে হালকা রাখে এবং অতিভোজনের কারণে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"صُومُوا تَصِحُّوا."

অর্থ:

"রোজা রাখো, সুস্থ থাকবে।"

(মুসনাদে আহমদ: ১৬৫২২)

iii) রোজার দীর্ঘমেয়াদী উপকার:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"الصِّيَامُ جُنَّةٌ."

অর্থ:

"রোজা হলো ঢাল।"

(সহিহ বুখারি: ১৮৯৪)

এই ঢাল শুধু আধ্যাত্মিক নয়, এটি শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করার মাধ্যমও।

---

৪. ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে শারীরিক উপকারিতার উদাহরণ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবাদের জীবনে রোজার শারীরিক উপকারিতা এবং তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোজা শুধু একটি ইবাদত নয়, বরং এটি তাদের শারীরিক শক্তি, ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সাহাবিদের জীবন থেকে উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

---

১. বদর যুদ্ধের সময় সাহাবাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি

ঘটনার পটভূমি:

বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ, যা রমজান মাসে সংঘটিত হয়। সাহাবারা রমজানের রোজা রেখে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

- রোজার মাধ্যমে তারা নিজেদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জন করেন।
- দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার শক্তি ও ধৈর্য ছিল।

রোজার প্রভাব:

- রোজার মাধ্যমে তাদের দেহ হালকা ছিল, যা তাদের যুদ্ধের সময় দ্রুত চলাচল এবং প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় সহায়ক হয়।
- রোজার সময় আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা তাদের মানসিক শক্তি বাড়িয়ে তুলেছিল।

কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ"

অর্থ:

"কত ছোট একটি দল আল্লাহর অনুমতিতে বড় একটি দলকে পরাজিত করেছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

(সূরা বাকারা: ২৪৯)

---

২. উহুদের যুদ্ধের সময় সাহাবাদের আত্মত্যাগ ও রোজা

ঘটনার পটভূমি:

উহুদের যুদ্ধে অনেক সাহাবি রোজা রেখে লড়াই করেছিলেন। তাদের আত্মনিবেদন এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

- উহুদের যুদ্ধে আহত সাহাবিরা রোজার কারণে তাদের ধৈর্য ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন।
- রোজার মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুভূতি তাদের কষ্ট সহ্য করার শক্তি দিয়েছিল।

হাদিসের দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

"الصِّيَامُ جُنَّةٌ."

অর্থ:

"রোজা হলো ঢাল।"

(সহিহ বুখারি: ১৮৯৪)

---

৩. তাবুক অভিযানে সাহাবাদের শারীরিক ধৈর্য

ঘটনার পটভূমি:

তাবুক অভিযান ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য অভিযান। সাহাবারা রোজা রেখেই এই কঠিন যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

- রোজা তাদের মনোবল এবং শারীরিক সহনশীলতাকে উন্নত করে।
- সাহাবাদের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার অনুভূতিকে রোজা নিয়ন্ত্রণ করেছিল, যা তাদের দৈহিক সক্ষমতা বাড়িয়েছিল।

কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআলা তাবুক অভিযানের বিষয়ে বলেন:

"إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ"

অর্থ:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান-মাল ক্রয় করেছেন, জান্নাত তাদের জন্য হবে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়।"

(সূরা তাওবা: ১১১)

---

৪. সাহাবি হজরত উসমান (রা.) এবং তার রোজার অভ্যাস

ঘটনা:

হজরত উসমান (রা.) পুরো রমজান মাসে রোজা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং দান করতেন। রোজার কারণে তার শরীর ও মন শুদ্ধ থাকত এবং তিনি দীর্ঘ সময় ইবাদতে কাটাতে পারতেন।

- তিনি দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকতে পারতেন, যা তার ইবাদতে মনোযোগ বৃদ্ধি করত।

রোজার শারীরিক উপকারিতা কুরআন, হাদিস এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এটি শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নয়, বরং শারীরিক সুস্থতা, রোগ প্রতিরোধ এবং মানসিক প্রশান্তির জন্যও অপরিহার্য।

রোজার মানসিক উপকারিতা: বিস্তারিত বিশ্লেষণ

রোজা শুধু শারীরিক ইবাদত নয়; এটি মানুষের মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত কার্যকর। রোজা মানুষের মনে একাগ্রতা, সংযম, ধৈর্য, এবং আল্লাহর উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করে। এটি আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যেও অসাধারণ ভূমিকা রাখে। নিচে কুরআন, হাদিস এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে রোজার মানসিক উপকারিতা বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

১। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানসিক উপকারিতা

i) স্ট্রেস এবং মানসিক চাপ কমানো:

রোজার সময় কর্টিসল (Cortisol) হরমোনের নিঃসরণ কমে, যা স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে।

- বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, রোজা রাখার সময় স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে এবং মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার ফলে মস্তিষ্কে নিউরোট্রফিন (BDNF) নামক প্রোটিন উৎপন্ন হয়, যা মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ii) মানসিক প্রশান্তি ও একাগ্রতা:

রোজা মানুষকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে এবং মনোযোগ বৃদ্ধি করে।

- ইফতার ও সেহরির সময় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে মানসিক শৃঙ্খলা তৈরি হয়।
- নিয়মিত রোজা আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়, যা হতাশা এবং উদ্বেগ কমাতে কার্যকর।

iii) ডোপামিন ও সেরোটোনিন হরমোনের উন্নতি:

রোজার সময় সেরোটোনিন এবং ডোপামিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা সুখ এবং প্রশান্তি বোধ তৈরি করে।

২। রোজা: ধৈর্য ও সংযমের প্রশিক্ষণ

রোজা মানুষকে ধৈর্যশীল হতে শেখায়। রোজার সময় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, যা মানুষের মানসিক স্থিতিশীলতা বাড়ায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"

অর্থ:

"ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

(সূরা বাকারা: ১৫৩)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ."

অর্থ:

"রোজা ধৈর্যের অর্ধেক।"

(সুনান ইবনে মাজাহ: ১৭৪৫)

৩। মানসিক প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি

রোজা মানসিক চাপ কমিয়ে আত্মশুদ্ধির একটি পথ তৈরি করে। দীর্ঘ এক মাসের সংযম মানুষকে আধ্যাত্মিক শান্তি এবং মানসিক শক্তি প্রদান করে।

আল্লাহ বলেন:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
অর্থ:
"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"
(সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ."
অর্থ:
"রোজাদারের জন্য রয়েছে দুই আনন্দ: একটি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়।"
(সহিহ বুখারি: ১৮৯৪)

৪। স্ট্রেস এবং উদ্বেগ কমানো
রোজার মাধ্যমে মানসিক চাপ বা স্ট্রেস উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। রোজার সময় কর্টিসল হরমোনের নিঃসরণ কমে, যা মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে।
আল্লাহ বলেন:
"الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"
অর্থ:
"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।"
(সূরা রাদ: ২৮)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ."
অর্থ:
"যদি তোমাদের কেউ রোজা রাখে, তবে সে যেন মন্দ কথা না বলে এবং উত্তেজিত না হয়। যদি কেউ তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তবে সে যেন বলে: 'আমি রোজাদার।'"
(সহিহ বুখারি: ১৮৯৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫১)
এই হাদিসে রোজার মাধ্যমে **স্ট্রেস এবং উদ্বেগ** নিয়ন্ত্রণের দিকটি স্পষ্ট।

৫। ধ্যান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি

রোজা মানুষের মনোযোগ বৃদ্ধি করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ায়। এটি মানুষকে খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে।

আল্লাহ বলেন:

"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا"

অর্থ:

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

(সূরা তালাক: ২)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"الصِّيَامُ جُنَّةٌ."

অর্থ:

"রোজা হলো ঢাল।"

(সহিহ বুখারি: ১৮৯৪)

রোজা মানসিক প্রশান্তি, ধৈর্য, এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অপরিহার্য ইবাদত। এটি শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতি নয়, বরং মানসিক স্থিতিশীলতা এবং সুখী জীবনের মূল ভিত্তি।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবিদের রোজার উদাহরণ: শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জন

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবিদের জীবনে রোজার গুরুত্ব শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি তাদের শারীরিক সহনশীলতা বৃদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি অর্জন, এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের এক কার্যকর উপায় হয়ে উঠেছিল। নিচে বিভিন্ন কাহিনি এবং ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে রোজার ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

---

১. রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রোজা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ

ঘটনা:

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রমজান মাসের রোজা পালনের পাশাপাশি নফল রোজা রাখতেন। তিনি একাধিক যুদ্ধের সময় রোজা পালন করেছিলেন এবং সাহাবিদের ধৈর্যের সাথে রোজা পালনের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন।

হাদিসের দলিল:

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ :إِنِّي صَائِمٌ."

অর্থ:

"রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: রোজা হলো ঢাল। যখন তোমরা রোজা রাখো, তখন অশ্লীল কথা বলো না এবং অজ্ঞতাসুলভ কাজ করো না। কেউ যদি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে বা গালি দেয়, তবে বলো: আমি রোজাদার।"

(সহিহ বুখারি: ১৮৯৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫১)

শারীরিক ও মানসিক প্রভাব:

- রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই শিক্ষা ধৈর্য ও আত্মসংযমের জন্য একটি আদর্শ উদাহরণ।
- মানসিক চাপ এবং উত্তেজনা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য রোজা ছিল একটি কার্যকর পদ্ধতি।

---

২. হজরত আবু বকর (রা.)-এর উদাহরণ: রোজা ও দানশীলতা

ঘটনা:

হজরত আবু বকর (রা.) রমজানের সময় শুধু রোজা রাখতেন না, বরং দান ও সদকা করে মানসিক প্রশান্তি অর্জন করতেন। রোজার মাধ্যমে তার অন্তরে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি পেত।

হাদিসের দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

"إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ."

অর্থ:

"নিশ্চয়ই দান-খয়রাত আল্লাহর ক্রোধকে নিবারণ করে এবং খারাপ মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে।"

(তিরমিজি: ৬৬৪)

প্রভাব:

- রোজার সঙ্গে দানশীলতা যোগ করে তিনি মানসিক প্রশান্তি অর্জন করতেন।
- রোজার মাধ্যমে তার শারীরিক সহনশীলতা এবং আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পেত।

---

৩. হজরত উমর (রা.)-এর ধৈর্য ও শৃঙ্খলার উদাহরণ

ঘটনা:

হজরত উমর (রা.) রোজার সময় নিজের রাগ এবং উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি দীর্ঘ সময় রোজা রাখার পরও শাসনকার্যে সক্রিয় থাকতেন।

উপদেশ:

তিনি বলতেন:

"رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً تَحَمَّلَ عَلَى نَفْسِهِ."

অর্থ:

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।"

প্রভাব:

- রোজার মাধ্যমে তিনি মানসিক চাপ ও উত্তেজনাকে দূর করতে পারতেন।
- তার ধৈর্যশীলতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অন্য সাহাবিদের জন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

---

৪. হজরত আলী (রা.)-এর রোজা ও যুদ্ধের শক্তি

ঘটনা:

হজরত আলী (রা.) রোজা রেখে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তার সাহসিকতা এবং শক্তি রোজার আত্মিক ও শারীরিক প্রভাবের উদাহরণ।

উপদেশ:

তিনি বলতেন:

"الصَّوْمُ تَزْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ وَقُوَّةٌ لِلرُّوحِ."

অর্থ:

"রোজা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং আত্মাকে শক্তি প্রদান করে।"

প্রভাব:

- রোজা তার শারীরিক শক্তি এবং মানসিক স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করত।

---

৫. হজরত বিলাল (রা.)-এর রোজার অভ্যাস

ঘটনা:

হজরত বিলাল (রা.) প্রায়শই নফল রোজা রাখতেন এবং তার ধৈর্য ও মানসিক শক্তির জন্য পরিচিত ছিলেন। কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি ধৈর্যের সঙ্গে রোজা পালন করতেন।

হাদিসের দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে নিয়ে বলেন:

"يَا بِلَالُ، بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟"

অর্থ:

"হে বিলাল! তুমি আমাকে জান্নাতে অগ্রগামী হলে কীভাবে?"

(সহিহ বুখারি: ১১৪৯)

প্রভাব:

- রোজা তাকে শারীরিক কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছিল।
- তার মানসিক ধৈর্য এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রোজার মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়েছিল।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবিদের জীবনে রোজার শারীরিক ও মানসিক প্রভাব ছিল অসাধারণ। রোজা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার শিক্ষা দিয়েছে।

রমজান মাসের বিশেষ আমল এবং রোজার সাথে সম্পর্কিত ইবাদত

রমজান মাস মুসলমানদের জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাত লাভের সময়। এই মাসে বিভিন্ন ইবাদত পালনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়। এখানে তারাবি, লাইলাতুল কদর, সেহরি, ইফতার, ইতিকাফ, দান-সদকা, যাকাত এবং ফিতরার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

---

১. তারাবির নামাজ

তারাবির নামাজ রমজান মাসের একটি বিশেষ ইবাদত। এটি রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবিদের সময় থেকে প্রচলিত। ইশার নামাজের পর তারাবি নামাজ আদায় করা হয়। তারাবি আরবি শব্দ "**تَرَاوِيح**" থেকে এসেছে, যার অর্থ বিশ্রাম। প্রতিটি চার রাকাতের পর মুসল্লিরা একটু বিশ্রাম নেন, তাই এ নামাজের নাম তারাবি।

তারাবির গুরুত্ব এবং ফজিলত

তারাবি নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। এটি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আত্মার প্রশান্তি আনে এবং রমজানের রোজাকে আরও অর্থবহ করে তোলে।

কুরআনের দলিল:

তারাবি নামাজ সরাসরি কুরআনে উল্লেখ নেই, তবে রমজানের রাতে ইবাদতের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

"وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا"

অর্থ:

"আর রাতের এক অংশে তাহাজ্জুদ পড়ো, এটি তোমার জন্য নফল। হতে পারে তোমার প্রভু

তোমাকে প্রশংসিত অবস্থানে উন্নীত করবেন।"

(সূরা আল-ইসরা: ৭৯)

এই আয়াত রাতের নামাজের প্রতি ইঙ্গিত দেয়, যা রমজানে তারাবির মাধ্যমে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

হাদিসের দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ."

অর্থ:

"যে ব্যক্তি ঈমান এবং সওয়াবের প্রত্যাশায় রমজানের রাতে নামাজ আদায় করে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"

(সহিহ বুখারি: ২০০৯, সহিহ মুসলিম: ৭৫৯)

তারাবির নামাজের রাকাত সংখ্যা

তারাবির রাকাত সংখ্যা নিয়ে ইসলামী স্কলারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

৮ রাকাত:

অনেকে বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আট রাকাত নামাজ আদায় করতেন।

হাদিস:

আয়েশা (রা.) বলেন:

"مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً."

অর্থ:

"রাসুলুল্লাহ (সা.) কখনো রমজান বা অন্য সময়ে এগারো রাকাতের বেশি নামাজ পড়তেন না।"

(সহিহ বুখারি: ১১৪৭, সহিহ মুসলিম: ৭৩৬)

২০ রাকাত:

হজরত উমর (রা.)-এর সময় সাহাবারা ২০ রাকাত তারাবি নামাজ পড়তেন।

বর্ণনা:

ইমাম মালেক (রহ.) মুআলাক বর্ণনায় উল্লেখ করেন:

"عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً."

অর্থ:

"উমর ইবনুল খাত্তাবের (রা.) সময় রমজানে তারা ২০ রাকাত নামাজ পড়তেন।"
(মুআত্তা ইমাম মালেক: ১)

তারাবি নামাজ জামাতে পড়ার ইতিহাস

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়:

রাসুলুল্লাহ (সা.) একাধিকবার মসজিদে সাহাবিদের সাথে তারাবি পড়েছেন। তবে তিনি নিয়মিত জামাতে পড়েননি।

হাদিস:

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত:

"خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ..."

অর্থ:

"এক রাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। কিছু লোক তার সাথে নামাজ পড়তে যোগ দিলেন।"
(সহিহ বুখারি: ২০১০)

তারাবির নিয়ম এবং করণীয়

১। ইশার নামাজের পর থেকে তাহাজ্জুদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তারাবি পড়া যায়।

২। তারাবির সময় ইমামের কুরআন তিলাওয়াত ধীরে এবং স্পষ্ট হওয়া উচিত।

৩। প্রতি চার রাকাতের পর কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেয়া মোস্তাহাব।
৪। বিরতির সময়ে যেকোনো দুয়া নিজের ভাষা অথবা আরবি ভাষায় করা যাবে, এইরকম অনেক দুয়া হাদিস এ বলা আছে ।

---

২. লাইলাতুল কদর (শবে কদর)

লাইলাতুল কদর হলো রমজান মাসের এমন একটি রাত, যা এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এই রাতটি আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাত লাভের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি রাত, যখন কুরআন নাজিল হয়েছিল।

লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও ফজিলত

এ রাতে আল্লাহ তা'আলা পুরা কুরআন কারীমকে লাউহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করেন। তাছাড়া অন্য আরেকটি মত আছে যে, এ রাতেই কুরআন নাযিল শুরু হয়। পরবর্তী ২৩ বছরে বিভিন্ন সূরা বা সূরার অংশবিশেষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর অবতীর্ণ হয়।

এ এক রজনীর ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

এ রাতে পৃথিবীতে অসংখ্য ফেরেশতা নেমে আসে এবং তারা তখন দুনিয়ার কল্যাণ, বরকত ও রহমাত বর্ষণ করতে থাকে।

লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব আল্লাহ তাআলা কুরআনের একটি সম্পূর্ণ সূরায় বর্ণনা করেছেন।

"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ."

অর্থ:

"নিশ্চয়ই আমরা এটি (কুরআন) লাইলাতুল কদরে নাজিল করেছি। আর আপনি জানেন লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) প্রত্যেক বিষয় নিয়ে তাদের রবের নির্দেশে অবতরণ করেন। এই রাত শান্তিতে পূর্ণ থাকে ফজর পর্যন্ত।"

(সূরা আল-কদর: ১-৫)

এটা শান্তি বর্ষণের রাত। এ রাতে ইবাদত গুজার বান্দাদেরকে ফেরেশতারা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির বাণী শুনায়।

এ রাতের ফাযীলত বর্ণনা করে এ রাতেই একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়। যার নাম সূরা কদর।

এ রাতে নফল সালাত আদায় করলে মুমিনদের অতীতের সগীরা গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ : **যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াব লাভের আশায় কদরের রাতে নফল সালাত আদায় ও রাত জেগে ইবাদত করবে আল্লাহ তার ইতোপূর্বের সকল সগীরা (ছোট) গুনাহ ক্ষমা করেদেন।**

(বুখারী : ১৯০১; মুসলিম : ৭৬০)

লাইলাতুল কদরের সঠিক সময়

এ রাতটি রমযান মাসে। আর এ রাতের ফযীলত কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। এ রাতটি রমাযানের শেষ দশকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"রমাযানের শেষ দশদিনে তোমরা কদরের রাত তালাশ কর।"

(বুখারী : ২০২০; মুসলিম : ১১৬৯)

আর এটি রমযানের বেজোড় রাতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَحَرُّوْا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"তোমরা রমাযানের শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত খোঁজ কর।"

(বুখারী : ২০১৭)

এ রাত রমযানের শেষ সাত দিনে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

"যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) অন্বেষণ করতে চায়, সে যেন রমাযানের শেষ সাত রাতের মধ্য তা অন্বেষণ করে।" *(বুখারী : ২০১৫; মুসলিম : ১১৬৫)*

রমাযানের ২৭ শে রজনী লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

উবাই ইবনে কাব হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

তিনি বলেন যে,

وَاللهِ إِنِّيْ لأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যতদূর জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে রজনীকে কদরের রাত হিসেবে কিয়ামুল্লাইল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হল রমাযানের ২৭ তম রাত। *(মুসলিম : ৭৬২)*

আব্দুল্লাহ বিন 'উমার থেকে বর্ণিত,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّبْعِ وَالْعِشْرِيْنَ

"যে ব্যক্তি কদরের রাত অর্জন করতে ইচ্ছুক, সে যেন তা রমাযানের ২৭শে রজনীতে অনুসন্ধান করে। *(আহমাদ : ২/১৫৭)*

কদরের রাত হওয়ার ব্যাপারে সম্ভাবনার দিক থেকে পরবর্তী দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল ২৫ তারিখ, তৃতীয় হল ২৯ তারিখে। চতুর্থ হল ২১ তারিখ। পঞ্চম হল ২৩ তারিখের রজনী।

সর্বশেষ আরেকটি মত হল- মহিমান্বিত এ রজনীটি স্থানান্তরশীল। অর্থাৎ প্রতি বৎসর একই তারিখে বা একই রজনীতে তা হয় না এবং শুধুমাত্র ২৭ তারিখেই এ রাতটি আসবে তা

নির্ধারিত নয়। আল্লাহর হিকমত ও তাঁর ইচ্ছায় কোন বছর তা ২৫ তারিখে, কোন বছর ২৩ তারিখে, কোন বছর ২১ তারিখে, আবার কোন বছর ২৯ তারিখেও হয়ে থাকে।

কীভাবে লাইলাতুল কদরে ইবাদত করবেনঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে এ রাত কাটাতেন এর পূর্ণ অনুসরণ করাই হবে আমাদের প্রধান টার্গেট। এ লক্ষ্যে আমাদের নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করা আবশ্যক :

(ক) নিজে রাত জেগে ইবাদত করা এবং নিজের অধীনস্ত ও অন্যদেরকেও জাগিয়ে ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করা।

(খ) লম্বা সময় নিয়ে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়া। এসব সালাতে কিরাআত ও রুকু-সিজদা লম্বা করা। রুকু থেকে উঠে এবং দুই সিজদায় মধ্যে আরো একটু বেশি সময় অতিবাহিত করা, এসময় কিছু দু'আ আছে সেগুলে পড়া।

(গ) সিজদার মধ্যে তাসবীহ পাঠ শেষে দু'আ করা। কেননা সিজদাবনত অবস্থায় মানুষ তার রবের সবচেয়ে নিকটে চলে যায়। ফলে তখন দু'আ কবুল হয়।

(ঘ) বেশি বেশি তাওবা করবে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বে। ছগীরা কবীরা গোনাহ থেকে মাফ চাইবে। বেশি করে শির্কী গোনাহ থেকে খালেছ ভাবে তাওবা করবে। কারণ ইতিপূর্বে কোন শির্ক করে থাকলে নেক আমল তো কবুল হবেই না, বরং অর্জিত অন্য ভাল আমলও বরবাদ হয়ে যাবে। ফলে হয়ে যাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

(ঙ) কুরআন তিলাওয়াত করবে। অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ কুরআন অধ্যয়নও করতে পারেন। তাসবীহ তাহলীল ও যিকর-আযকার করবেন। তবে যিকর করবেন চুপিসারে, নিরবে ও একাকী এবং কোন প্রকার জোরে আওয়ায করা ছাড়া। এভাবে যিকর করার জন্যই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন :

﴿ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفۡسِكَ تَضَرُّعٗا وَخِيفَةٗ وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ ٢٠٥ ﴾ [الاعراف: ٢٠٥]

"সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার রবের যিকর কর মনে মনে বিনয়ের সঙ্গে ভয়ভীতি সহকারে এবং জোরে আওয়াজ না করে। এবং কখনো তোমরা আল্লাহর যিকর ও স্মরণ থেকে উদাসীন হয়োনা।" *(আরাফ : ২০৫)*

অতএব, দলবেধে সমস্বরে জোরে জোরে উচ্চ স্বরে যিকর করা বৈধ নয়। এভাবে সম্মিলিত কোন যিকর করা কুরআনেও নিষেধ আছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তা করেন নি। যিকরের শব্দগুলো হল: সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি।

(চ) একাগ্রচিত্তে দু'আ করা। বেশি বেশি ও বারবার দু'আ করা। আর এসব দু'আ হবে একাকী ও বিনম্র চিত্তে কবুল হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে। দু'আ করবেন নিজের ও আপনজনদের

জন্য. জীবিত ও মৃতদের জন্য, পাপমোচন ও রহমত লাভের জন্য, দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে নিম্নের এ দু'আটি বেশি বেশি করার জন্য উৎসাহিত করেছেন :

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

"হে আল্লাহ! তুমি তো ক্ষমার আধার, আর ক্ষমা করাকে তুমি ভালবাস। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। *(তিরমিযী : ৩৫১৩)*

এই রাতে দান-সদকা করলে বহু গুণ সওয়াব লাভ করা যায় অন্যান্য দিন এর চেয়ে।

নবীকরিম এবং সাহাবিদের লাইলাতুল কদরের আমল

১। নবী করীম (সঃ) :

প্রথম ২০ রাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ রাত জাগরণ করতেন না। কিছু সময় ইবাদত করতেন, আর কিছু অংশ ঘুমিয়ে কাটাতেন। কিন্তু রমাযানের শেষ দশ রাতে তিনি বিছানায় একেবারেই যেতেন না। রাতের পুরো অংশটাই ইবাদত করে কাটাতেন। সে সময় তিনি কুরআন তিলাওয়াত, সালাত আদায় সদাকা প্রদান, যিকর, দুআ, আত্মসমালোচনা ও তাওবাহ করে কাটাতেন। আল্লাহর রহমাতের আশা ও তার গজবের ভয়ভীতি নিয়ে সম্পূর্ণ খুশুখুজু ও বিনম্রচিত্তে ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

হাদীসে এসেছে সে সময় তিনি শক্ত করে তার লুঙ্গি দ্বারা কোমর বেধে নিতেন। এর অর্থ হল, রাতগুলোতে। তাঁর সমস্ত শ্রম শুধু ইবাদতের মধ্যেই নিমগ্ন ছিল। নিজে যেমন অনিদ্রায় কাটাতেন তাঁর স্ত্রীদেরকেও তখন জাগিয়ে দিতেন ইবাদত করার জন্য।

কদরের রাতের ইবাদতের সুযোগ যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সেজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশদিনের পুরো সময়টাতে ইতেকাফরত থাকতেন। *(মুসলিম: ১১৬৭)*

১. হজরত উমর (রা.):

তিনি লাইলাতুল কদরের রাতে বেশি সময় মসজিদে কাটাতেন এবং কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন।

২. হজরত উসমান (রা.):

তিনি এক রাতেই পুরো কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন।

৩. হজরত আলী (রা.):

তিনি দোয়া এবং ইসতেগফারে মনোযোগী হতেন। তিনি বলতেন, এই রাত হলো এমন এক

সময়, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

---

৩. সেহরি

সাধারণত শেষ রাতের খাবারকে সেহরি বলে । শরীয়তের পরিভাষায়, সুবহে সাদিকের পূর্বে রোযার নিয়তে পানাহার করাকে সেহরি বলা হয়। সেহরি খাওয়া সুন্নত। সেহরি খাওয়ার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই প্রয়োজন না থাকলেও সামান্য কিছু পানাহার করতে হবে, নতুবা মাকরূহ হবে। যেহেতু সেহরির সময় হল শেষ রাত। ফকীহ আবুল লাইস (রাঃ) বলেন, সেহরির সময় হল রাতের শেষ । এটি রোজার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। সেহরি শুধু শরীরকে রোজার জন্য প্রস্তুত করে না, বরং এটি আল্লাহর বরকত ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষ সুন্নত হিসেবে বিবেচিত হয়।

সেহরির ফজিলত

১. আল্লাহর বরকত লাভ

রাসুলুল্লাহ (সা.) সেহরির মধ্যে বরকত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। এটি শুধু শরীরিক শক্তি অর্জনের জন্য নয়, বরং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি এবং আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম।

হাদিস:

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً."

অর্থ:

"তোমরা সেহরি খাও, কারণ সেহরির মধ্যে বরকত রয়েছে।"

(সহিহ বুখারি: ১৯২৩, সহিহ মুসলিম: ১০৯৫)

২. ফেরেশতাদের দোয়া লাভ

সেহরি গ্রহণকারীদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করেন। এটি আল্লাহর রহমত লাভের একটি অন্যতম সময়।

হাদিস:

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ."

অর্থ:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা সেহরি গ্রহণকারীদের প্রতি দোয়া করেন।"

(মুসনাদে আহমদ: ৪৪৭৯)

সেহরির গুরুত্ব এবং সময়

১. সেহরি রোজা শুরুর পূর্বে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে।

২. এটি রোজাদারের জন্য ইবাদতে মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়ক।

৩. সেহরি সুন্নত, যা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণে গুরুত্বপূর্ণ।

সেহরির সময়:

সেহরির সময় শেষ হয় ফজরের আজানের সাথে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেহরি গ্রহণ করতেন।

হাদিস:

জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন:

"تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً."

অর্থ:

"আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সেহরি খেয়েছি। তারপর তিনি নামাজের জন্য দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম: আজান এবং সেহরির মধ্যে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন: প্রায় পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াতের সময়।"

(সহিহ বুখারি: ১৯২১, সহিহ মুসলিম: ১০৯৭)

সাহাবিদের সেহরি গ্রহণের উদাহরণ

হজরত উমর (রা.):

তিনি সেহরির সময় সাহাবাদের উৎসাহ দিতেন এবং বলতেন, সেহরি শুধু খাবার নয়, এটি ইবাদতের একটি অংশ।

আবু হুরাইরা (রা.):

তিনি বলেন, সেহরির সময় এমন কিছু গ্রহণ করতে হবে, যা সহজে হজম হয় এবং শক্তি যোগায়।

হজরত আলি (রা.):

তিনি বলেন, সেহরির মাধ্যমে দিনব্যাপী রোজার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

সেহরির খাবার সংক্রান্ত সুন্নত

১. খেজুর:

রাসুলুল্লাহ (সা.) সেহরির সময় খেজুর খাওয়া পছন্দ করতেন।

হাদিস:

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত:

"نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ."

অর্থ:

"মুমিনের জন্য উত্তম সেহরি হলো খেজুর।"

(সুনান আবু দাউদ: ২৩৪৫)

২. **পানি:**

পানি সেহরির সময় গ্রহণ করা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি সুন্নত।

সেহরির সময় অতিরিক্ত না খেয়ে পরিমিত পরিমাণে খাওয়া সুন্নত। এটি শরীরকে ভারমুক্ত এবং দিনব্যাপী কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে।

---

৪. ইফতার

ইফতার হলো রোজার সমাপ্তি এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রোজা ভাঙার একটি সুন্নত ইবাদত। এটি রোজার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যম। ইফতারের মাধ্যমে রোজাদার বান্দা আল্লাহর আনুগত্যের আরেকটি উদাহরণ স্থাপন করেন।

ইফতারের গুরুত্ব ও ফজিলত

১. ইফতারের সময় দ্রুত রোজা ভাঙার সুন্নত

ইফতারের সময় বিলম্ব না করে দ্রুত রোজা ভাঙা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নত।

হাদিস:

সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত:

"لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ."

অর্থ:

"মানুষ তখনই কল্যাণে থাকে, যখন তারা ইফতারে বিলম্ব না করে।"

(সহিহ বুখারি: ১৯৫৭, সহিহ মুসলিম: ১০৯৮)

২. ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়

ইফতারের সময় দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সময়ে আল্লাহ বান্দার দোয়া কবুল করেন।

হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ..."

অর্থ:

"তিন ব্যক্তির দোয়া কখনো প্রত্যাখ্যান হয় না: রোজাদারের দোয়া যখন সে ইফতার করে..."

(সুনান তিরমিজি: ২৫২৮)

৩. রোজাদারের জন্য বিশেষ আনন্দ

ইফতারের সময় রোজাদারের জন্য একটি আনন্দের মুহূর্ত আসে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ।

হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ."

অর্থ:

"রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ: একটি ইফতারের সময়, এবং অন্যটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়।"

(সহিহ বুখারি: ১৮৯৪)

কুরআনের আলোকে ইফতারের সময়

কুরআনের নির্দেশ:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ."

অর্থ:

"তোমরা রোজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৭)

এই আয়াত ইফতারের সময়সূচি নির্ধারণ করে দেয় যে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রোজা ভাঙতে হবে।

ইফতারের নিয়ম এবং করণীয়

১. কীভাবে ইফতার করবেন?

রাসুলুল্লাহ (সা.) খেজুর এবং পানি দিয়ে ইফতার শুরু করতেন।

হাদিস:

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ."

অর্থ:

"রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজের আগে তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তা না পাওয়া যেত, তাহলে শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আর যদি খেজুর না থাকত, তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করতেন।"

(সুনান আবু দাউদ: ২৩৫৬)

২. ইফতারের দোয়া:

হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইফতারের সময় এই দোয়া পড়তেন:

"ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ."

অর্থ:

"তৃষ্ণা দূর হয়েছে, শিরাগুলো সতেজ হয়েছে এবং আল্লাহ চাইলে সওয়াব নিশ্চিত হয়েছে।"

(সুনান আবু দাউদ: ২৩৫৭)

সাহাবিদের ইফতার নিয়ে কাহিনি

হজরত উমর (রা.):

তিনি ইফতারের সময় দরিদ্রদের দান করতেন এবং নিজে অত্যন্ত সরলভাবে ইফতার করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.):

তিনি ইফতারের সময় অনাথ এবং দরিদ্রদের সাথে বসে ইফতার করতেন। যদি কোনো মিসকিন না থাকত, তবে তিনি ইফতার গ্রহণ করতেন না।

হজরত আনাস (রা.):

তিনি সর্বদা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণ করে খেজুর এবং পানি দিয়ে ইফতার করতেন এবং অন্যদেরও তা করতে উৎসাহিত করতেন।

ইফতারের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

১. খেজুর এবং পানি শরীরকে দ্রুত শক্তি দেয়।

২. সহজপাচ্য খাবার পাকস্থলীর উপর চাপ কমায়।

৩. ইফতারের পর ধীরে ধীরে খাবার খাওয়া সুস্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

৫. ইতিকাফ

ইতিকাফ হলো এক ধরনের ইবাদত, যেখানে একজন মুমিন নির্দিষ্ট সময় মসজিদে অবস্থান করেন এবং দুনিয়াবি কাজ থেকে বিরত থেকে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন। এটি রমজানের শেষ দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম।

ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ."

অর্থ:

"আর যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফে থাকো, তখন স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৭)

এই আয়াত ইতিকাফের গুরুত্ব এবং মসজিদে অবস্থানের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

হাদিসের দলিল:

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত:

"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ."

অর্থ:

"প্রতিটি রমজানে রাসুলুল্লাহ (সা.) দশ দিন ইতিকাফ করতেন।"

(সহিহ বুখারি: ২০২৫, সহিহ মুসলিম: ১১৭১)

ইতিকাফের সময় এবং স্থান

কখন ইতিকাফ করবেন?

ইতিকাফ সাধারণত রমজানের শেষ দশ দিনে করা হয়। এটি লাইলাতুল কদরের সন্ধানের একটি উত্তম পদ্ধতি।

হাদিস:

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا."

অর্থ:

"প্রতিটি রমজানে রাসুলুল্লাহ (সা.) দশ দিন ইতিকাফ করতেন। আর যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন।"

(সহিহ বুখারি: ২০৪৪)

ইতিকাফের স্থান:

১। পুরুষদের জন্য ইতিকাফ মসজিদে করা সুন্নত।

২। মহিলারা ইতিকাফ তাদের ঘরের একটি নির্ধারিত স্থানে করতে পারেন।

ইতিকাফের উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা

উদ্দেশ্য:

১। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

২। লাইলাতুল কদর সন্ধান করা।

৩। আত্মশুদ্ধি এবং ইবাদতে মনোযোগী হওয়া।

উপকারিতা:

১।দুনিয়াবি কাজ থেকে বিরত থাকা।

২। আত্মার প্রশান্তি অর্জন।

৩। পাপ থেকে দূরে থাকার সুযোগ।

ইতিকাফের করণীয় কাজ

১। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা।

২। তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া।

৩। দোয়া, ইসতেগফার এবং জিকিরে সময় ব্যয় করা।

৪। দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৫। অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবি কথাবার্তা না বলা

ইতিকাফের বিধি-নিষেধ

১। মসজিদের বাইরে অপ্রয়োজনীয় কাজে বের হওয়া যাবে না।

২। স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ।

৩। অহেতুক কথা বলা বা সময় নষ্ট করা যাবে না।

সাহাবিদের ইতিকাফ নিয়ে ঘটনা

হজরত উমর (রা.):

তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে জানতে চাইলেন, তিনি একটি নিয়ত করেছেন মসজিদে একদিন ইতিকাফ করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন:

"أَوْفِ بِنَذْرِكَ."

অর্থ:

"তোমার মানত পূর্ণ করো।"

(সহিহ বুখারি: ২০৩২)

আয়েশা (রা.):

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে থাকতেন এবং পরিবারের সদস্যরা তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসতেন। তিনি দুনিয়াবি কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থেকে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

ইতিকাফের ফজিলত

১। ইতিকাফ আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের উত্তম মাধ্যম।

২। লাইলাতুল কদর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩। রমজানের বরকত এবং মাগফিরাত লাভের একটি বিশেষ সুযোগ।

হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"مَنْ اعْتَكَفَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ."

অর্থ:

"যে ব্যক্তি ঈমান এবং সওয়াবের প্রত্যাশায় ইতিকাফ করবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"

(সহিহ মুসলিম: ১১৭২)

---

৭. যাকাত ও ফিতরা

ফিতরা এবং যাকাত রমজান মাসের গুরুত্বপূর্ণ দুটি ইবাদত। ফিতরা হলো ঈদুল ফিতরের আগে আদায়যোগ্য একটি বিশেষ সদকা, আর যাকাত হলো প্রতিবছর নির্ধারিত সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ গরিবদের মাঝে বিতরণের ফরজ ইবাদত। উভয়টি আত্মিক শুদ্ধি এবং দরিদ্রদের সহায়তার একটি মহান পন্থা।

ফিতরা (সদকাতুল ফিতর)

ফিতরার সংজ্ঞা

ফিতরা ঈদুল ফিতরের পূর্বে আদায়যোগ্য একটি বিশেষ দান, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এটি রোজার শুদ্ধি এবং গরিবদের জন্য ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার একটি উপায়।

ফিতরার ফজিলত

১. রোজার শুদ্ধিকরণ

ফিতরা রোজার সময় করা ভুলত্রুটি ও খুতির জন্য একটি শুদ্ধিকর দান।

হাদিস:

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত:

"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ."

অর্থ:

"রাসুলুল্লাহ (সা.) ফিতরা ফরজ করেছেন, যা রোজাদারকে অপ্রয়োজনীয় ও অশালীন কথা থেকে শুদ্ধ করে এবং এটি গরিবদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে।"

(সুনান আবু দাউদ: ১৬০৯)

২. ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি:

ফিতরার মাধ্যমে গরিবদের জন্য ঈদের দিন খাদ্যের ব্যবস্থা হয়, যা তাদের ঈদের আনন্দে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

ফিতরা আদায়ের সময়:

১. ঈদের আগের রাতে থেকে ঈদের নামাজের আগে।

২. নামাজের পরে আদায় করলে এটি সাধারণ সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

হাদিস:

ইবনে ওমর (রা.) বলেন:

"وَأَمَرَ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ."

অর্থ:

"রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, ফিতরা ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে আদায় করতে।"

(সহিহ বুখারি: ১৫০৩)

ফিতরার পরিমাণ এবং আদায়ের নিয়ম

১. ফিতরার পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে এক **সা'** খাদ্য (প্রায় সাড়ে তিন কেজি গম, খেজুর, আটা বা যব)।

২. এটি পরিবারপ্রতি সব সদস্যের জন্য আদায় করতে হবে।

সাহাবিদের ফিতরা আদায়ের উদাহরণ

হজরত ওসমান (রা.) এবং হজরত আলী (রা.) ঈদের আগের দিন গরিবদের মাঝে ফিতরা বিতরণ করতেন, যাতে তারা ঈদের দিন আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারে।

যাকাত (ফরজ দান)

যাকাতের সংজ্ঞা

যাকাত হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। এটি সম্পদ থেকে নির্ধারিত অংশ বের করে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করার ফরজ বিধান।

যাকাতের ফজিলত

১. সম্পদ পবিত্র করা

যাকাত সম্পদকে শুদ্ধ এবং বরকতময় করে।

কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا."

অর্থ:

"তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, যা তাদের পবিত্র করবে এবং তাদের শুদ্ধ করবে।"

(সূরা তাওবা: ১০৩)

২. গুনাহ মাফ:

যাকাত দিলে গুনাহ মাফ হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়।

হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ."

অর্থ:

"যাকাত গুনাহ নিঃশেষ করে, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়।"

(তিরমিজি: ৬১৪)

৩. গরিবদের সহায়তা:

যাকাত সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বড় সহায়তা। এটি আর্থিক ভারসাম্য তৈরি করে।

যাকাতের শর্ত এবং নিয়ম

১. যাকাত আদায় করতে হবে সম্পদের নির্ধারিত অংশ (সাধারণত ২.৫%)।

২. এটি শুধু সোনা, রূপা, নগদ অর্থ, ব্যবসার পণ্য এবং নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর প্রযোজ্য।

৩. যাকাত আদায় করতে হবে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী, যা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত।

যাকাতের সময়:

যাকাত সাধারণত বছর শেষে নির্ধারিত হয়, **তবে রমজানে যাকাত আদায় করা উত্তম।**

হাদিস:

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ."

অর্থ:

"রমজানে সদকা (যাকাত) হলো সর্বোত্তম দান।"

(তিরমিজি: ৬৬৩)

সাহাবিদের যাকাতের উদাহরণ

হজরত আবু বকর (রা.):

তিনি সব সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতেন এবং দরিদ্রদের সাহায্য করতেন।

হজরত ওমর (রা.):

তিনি তার সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর পথে দান করতেন।

হজরত উসমান (রা.):

তিনি প্রচুর যাকাত এবং সদকা করতেন। তার দানের কারণে অনেক গরিব মুসলমান আর্থিকভাবে সাবলম্বী হন।

রোজা ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব

রমজান মাসের রোজা শুধু একজন ব্যক্তির আত্মিক শুদ্ধির জন্য নয়, বরং এটি সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। রোজার মাধ্যমে ধনী-গরিবের মধ্যে সংহতি, পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি এবং সামাজিক অন্যায় প্রতিরোধে ভূমিকা রাখা হয়।

---

১. রোজার মাধ্যমে ধনী-গরিবের মাঝে সংহতি

রোজা ধনী-গরিবের মাঝে পার্থক্য বিলুপ্ত করে এবং তাদের মধ্যে সমবেদনা ও সংহতি সৃষ্টি করে। রোজা রাখার সময় গরিবরা ধনীদের জন্য দোয়া করে এবং ধনীরা গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। রোজা শুধু খাদ্য থেকে বিরত থাকার বিষয় নয়, এটি আত্মিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এক ধরনের শিক্ষা দেয়।

কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"لَا تَسْأَلُونِ النَّاسَ إِلَّا لِيُغْنِيَكُمْ فَذُو الْفَقْرِ فَكُونُوا صَابِرِينَ."

অর্থ:

"তোমরা গরিবের জন্য দানের মাধ্যমে সাহায্য করবে এবং তাদের ধৈর্য ধারণ করতে বলবে।"

(সূরা আল-বাকারা: ২৭৩)

রোজা পালন করলে ধনী-গরিবের মাঝে সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্যের মনোভাব গড়ে ওঠে। ধনীরা গরিবদের কষ্ট অনুভব করেন এবং সেই অনুযায়ী দান-সদকা করেন, যা সামাজিক অস্থিরতা কমায়।

---

২. পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে রোজার ভূমিকা

রোজা পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতিতে বড় ভূমিকা রাখে। রোজার সময় পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সাথে অধিক সময় কাটান, একসঙ্গে ইফতার করেন এবং একে অপরকে দোয়া করেন। এটি পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা আনে।

হাদিসের দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"الْأَسْرَةُ أَوْلَى مِنْ أَنْ تَفْعَلُوا فِي لَيْلَةِ الرَّمَضَانِ."

অর্থ:

"রোজার রাতগুলোতে পরিবারের সাথে সময় কাটানো গুরুত্বপূর্ণ।"

(সহিহ মুসলিম)

রোজার সময় মসজিদে যাওয়া, নামাজে অংশগ্রহণ এবং পারিবারিক ইফতার থেকে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়। এটি পরিবারের মাঝে সৌহার্দ্য এবং ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

---

৩. সামাজিক অন্যায় প্রতিরোধে রোজার ভূমিকা

রোজা সামাজিক অন্যায় ও অশুভ কর্মের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। রোজার মাধ্যমে মানুষ ধৈর্য ধারণ করতে শিখে এবং অশ্লীলতা, মিথ্যা, গীবত, এবং

অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখে। রোজা মানুষকে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল এবং নৈতিকভাবে শুদ্ধ করে তোলে।

কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"وَجَاهِدُوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّهُ أَحْسَنُ تَذْكِيرًا."

অর্থ:

"রোজার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন এবং নৈতিকতা অর্জন হয়।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)

রোজা একজন ব্যক্তিকে ধৈর্যশীল এবং আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, যাতে সে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হয়।

---

৪. রোজার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি এবং সহানুভূতির উন্নতি

রোজা কেবল আত্মশুদ্ধির জন্য নয়, এটি সমগ্র সমাজের জন্য একটি উন্নতির পথ হিসেবে কাজ করে। রোজার মাধ্যমে সমাজে দারিদ্র্য হ্রাস পায়, কারণ ধনী ও গরিবদের মধ্যে সহানুভূতির বোধ গড়ে ওঠে এবং একে অপরের জন্য সহায়ক হতে চায়।

হাদিসের দলিল:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالصَّائِمِ لَا يَكُونُ قَوْلُهُ صَادِقًا."

অর্থ:

"যে ব্যক্তি রোজা পালন না করে, তার কথা কখনো সত্য হতে পারে না।"

(সহিহ বুখারি: ১৮৫৪)

এটি আল্লাহর নির্দেশ যে, সমাজে শান্তি এবং সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য রোজা পালন করা অপরিহার্য। রোজা শুধু ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়, এটি সমাজের কল্যাণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

রোজা শুধু একটি ইবাদত নয়, এটি সামাজিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধনী-গরিবের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি, পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি, এবং সামাজিক অন্যায় প্রতিরোধে রোজার ভূমিকা অপরিসীম। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণে রোজা পালনের মাধ্যমে একজন মুসলিম তার আত্মিক এবং সামাজিক উন্নতি সাধন করতে পারে।

উপসংহার

রোজা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা শুধুমাত্র একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম নয়; বরং এটি শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে অনন্য প্রভাব ফেলে। কুরআন, হাদিস, এবং ইসলামী শিক্ষায় রোজার বহুমুখী গুরুত্ব এবং ফজিলত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

রমজান মাসে রোজা মানুষকে ধৈর্যশীল এবং সংযমী হতে শেখায়। এটি ধনী-গরিবের মধ্যে সংহতি তৈরি করে, পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটায় এবং সামাজিক অন্যায় প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। রোজা আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মশুদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

তাই, রোজার গুরুত্ব শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন এবং সামাজিক কাঠামোতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামic শিক্ষার আলোকে আমাদের উচিত রোজার মূল শিক্ষা এবং লক্ষ্য বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। আল্লাহ আমাদের রোজার সকল ফজিলত অর্জনের তৌফিক দান করুন।

আল্লাহ আমাদের এই ইবাদত কবুল করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র

- ডাঃ দেওয়ান একেএম আবদুর রহীম। *চিকিৎসা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে রোজা।* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১২।
- মুহাম্মদ ইকবাল কিলানি । *পবিত্র রমযান গুনাহ মাফ এর মাস* । পিস পাবলিকেশন । বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৩ ।
- আমিনুল ইসলাম । *রমযানের শিক্ষা ও মুমিন জীবন* । বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম, ২০১১ ।
- মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন । *আহকামুন নিসা* । মাক্তাবুল আশ্রাফ, ঢাকা, ২০২০।
- মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দামাত বারাকাতুহুম। *রমযান মাস – গুরুত্ব ও করনীয়* । মাক্তাবুল ফুরকান , ঢাকা, ২০১৫ ।
- মাওলানা শফিকুর রহমান নদভি (রহঃ)। *আল ফিখহুল মুয়াসসার*। ইসলামিয়া কুতুবখানা , ঢাকা ।
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। *রমজান এবং রোজা।* মাকতাবাতুল হাসান, ঢাকা, ২০০৮।